ইউনিট ৫: বিশ্বায়ন, সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষা ও উন্নয়ন

ভূমিকা

বিশ্বায়ন একটি আধুনিক ধারণা। একুশ শতকের আলোচনায় এটি একটি মূখ্য বিষয়। বিশেষ করে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাতে বিশ্বায়নের কদর অনেক। এ ধারণাটি অতীতেও ছিল। অতীত অপেক্ষা বর্তমানে এটির প্রকৃতি ও ধারণা ভিন্নতর। বর্তমান যুগ হলো তথ্য প্রবাহের যুগ। এ যুগে বিশ্বায়নের কদর ও গ্রহণযোগ্যতা অনেক। বিশ্বায়নের ধারণা উত্তম সূচনা লক্ষ করা যায় গত শতকের শেষ দশকে। বর্তমানে এ দ্রুত বিস্তার ঘটেছে। দেশে দেশে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন এসেছে। এর প্রেক্ষিতে শিক্ষা ক্ষেত্রেও উন্নয়নের গতি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া সমগ্র দেশ এক বিশ্ব রাষ্ট্রের নাগরিতে পরিণত হওয়ার কারণে শিক্ষা উন্নয়নে ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা সহায়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে শিক্ষা উন্নয়নে নিম্নেলিখিত পাঠগুলোর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

পাঠ	৫.১	:	বিশ্বায়নের প্রকৃতি; আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক
পাঠ	৫.২	:	বিভিন্ন ধরনের শিক্ষায় বিশ্বায়নের প্রভাব ও প্রতিবন্ধকতা
পাঠ	৫.৩	:	বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে উন্নয়ন ও শিক্ষা
পাঠ	৫.৪	:	জ্ঞান, দক্ষতা ও আবেগের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব
পাঠ	৫.৫	:	জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অভিপ্রয়াণ এবং নগরায়ন
পাঠ	৫.৬	:	গ্রাম এবং শহরাঞ্চলের শিখনের চাহিদা ও অবস্থাসমূহ
পাঠ	৫.৭	:	মান নির্দেশক: পরিবেশ, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও জীবন যাত্রার মান
পাঠ	৫.৮	:	সাংস্কৃতিক বিশ্বাস এবং দৃষ্টিভঙ্গি
পাঠ	৫.৯	:	শিক্ষা উন্নয়নে সহায়তা: শর্তযুক্ত ও বহুপাক্ষিক সাহায্য করা
পাঠ	৫.১০	:	শিক্ষা এবং উন্নয়নে ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, ইউএনডিপি, বিশ্ব ব্যাংক, সেভ দি চিলড্রেন ও ব্র্যাক সংস্থার ভূমিকা

পাঠ- ৫.১: বিশ্বায়নের প্রকৃতি: আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক Nature of Globalization; Socio Economic, Cultural, Political

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিশ্বায়ন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিশ্বায়নের প্রকৃতি, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

বিশ্বায়ন (Globalization)

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহকে একটি নিয়মের অর্ন্তভুক্ত করাকে বিশ্বায়ন বলে। বিশ্বায়ন বিষয়টি সাম্প্রতিক সময়ে জগৎ জোড়া উদ্দীপনা ও আলোড়ন সৃষ্টি করে চলেছে। বিশ্বময় কিছু লোক এটিকে খুবই প্রয়োজনীয় এবং ভবিষ্যৎ বিশ্ব অর্থনীতির চাবিকাঠি বলে মনে করেন যা বিশ্ব অর্থনীতির উন্নতির জন্য অপরিহার্য এবং এর গতি একেবারে অপ্রতিরোধ্য বলে বিশ্বাস করেন। তাদের মতে বিশ্বায়ন হচ্ছে অবারিত সুযোগের হাতছানি। এর সুফল ভোগ করবেন তাঁরা যারা এর ক্ষতিকর দিকটিকে সযত্নে পরিহার করবেন ও কাজে লাগাবেন এর বিশাল সুযোগ সুবিধাগুলো।

বিশ্বায়ন হলো পারস্পরিক ক্রিয়া এবং আন্তঃসংযোগ সৃষ্টিকারী এমন একটি পদ্ধতি জাতির সরকার, প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের মধ্যে সমন্বয় ও মিথস্ক্রিয়ার সূচনা করে। এই পদ্ধতির চালিকাশক্তি হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ, আর এর প্রধান সহায়ক শক্তি হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি। সকল কিছুর উপরই এর সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান।

বিশ্বায়নের প্রকৃতি আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

বিগত প্রায় ৫০০ (পাঁচশত) বছর ধরে বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের তিনটি প্রধান শক্তি। ঐ সকল শক্তি কেন্দ্রের উৎস থেকে উত্থিত শক্তি প্রবাহ সমগ্র মানব জাতির জীবন-রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতিকে করছে প্রভাবিত। তিনটির প্রথমটি ছিল পাশ্চাত্য জাতিসমূহের উত্থান, যা শুরু হয়েছিল ১৫০০ শতাব্দীর শুরু থেকে এবং তা স্বমহিমায় বিশ্ব পরিক্রম করছিল বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ লগ্ন পর্যন্ত। এই সময়কালে সে অভূতপূর্বভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করে উৎপাদন করলো আধুনিকায়নের (Modernity), ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রগতি এবং ধনতন্ত্রবাদের। বিপ্লব সাধন করলো কৃষি এবং শিল্প ক্ষেত্রে। এর মাধ্যমে সে দীর্ঘ দিন ধরে বিশ্বময় পাশ্চাত্য জগতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব ধরে রাখলো এবং শাসন করলো বিশ্বের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশকে।

ঊনবিংশ শতাব্দির শেষ ভাগে দ্বিতীয় শক্তিটি একক ক্ষমতা ধর রূপে আবির্ভূত হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বিগত শতাব্দী থেকে বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিক্ষা ও সংস্কৃতিসহ প্রতিটি অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের (USSR) পতনের পর বিশ্বে সে হয়ে উঠলো অপ্রতিদ্বন্দ্বি ও অপ্রতিরোধ্য এবং একক বিশ্ব শক্তির অধিকারী।

বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে ঠাণ্ডা যুদ্ধের (Cold war) অবসানের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বিশ্বায়নের যে সূচনা হলো তারি ধারাবাহিকতায় ছোট-বড় জাতিসমূহকে নিয়ে সম্মিলিত অর্থনৈতিক শক্তির উন্মেষ শুরু হল। শুরু হল বিশ্ব ব্যাপী মুক্ত বাজার অর্থনীতির অসীম প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় জিতবে কেবল যোগ্যতমরাই

(Survival of the fittest)। বিশ্বব্যাপী এ বিশাল প্রতিযোগিতায় নিজেদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে যোগ্য আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে না পারলে অসীম সমৃদ্ধি ও বিপুল সম্ভাবনার হাতছানি সত্ত্বেও বাংলাদেশকে বিশ্বায়নের এই চ্যালেঞ্জ থেকে ছিটকে পড়তে হতে পারে। তাই আমাদেরকে বিশ্বয়ানের গতি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এখনই কতগুলো বিষয় বিশ্লেষণ করে সঠিক কর্মসূচি গ্রহণ করে অগ্রসর হতে হবে। তবে আশার দিক হলো আমাদের উদীয়মান তরুণ শিক্ষিত সমাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে, দেশের অভ্যন্তরে যেমন উদ্যোগ নিচ্ছে ছোট-বড় কলকারখানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে। উদ্যোগ নিচ্ছে কৃষি, কৃষি ভিত্তিক শিল্পে ও বিনিয়োগে। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আমদানি-রপ্তানিতে তেমনি ১ কোটি বাংলাদেশি বিশ্বের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দীপ্ত পদে দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে চলেছে। বিশ্ব দরবারে নিজেদেরকে সক্ষমভাবে মেলে ধরছে এবং তাদের প্রেরিত বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের বিকাশমান অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তিরূপে কাজ করছে। বিকশিত হচ্ছে আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতি এবং দেশে আসছে নতুন প্রযুক্তি।

মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল অলস পুঁজি কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে ঐ অঞ্চলের কৃষ্টি কালচারের সাথে সংগতি সম্পন্ন লোকবল সৃষ্টি করা ছাড়াও আমাদের দেশে তাদের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive Economic Zone) সৃষ্টি করা এবং মধ্যপ্রাচ্যে ও অন্যত্র আমাদের সম্পর্কে প্রচারণার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেহেতু আমাদের প্রায় অর্ধকোটিরও বেশি লোক মধ্য প্রাচ্যে কাজ করেন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেন, অথচ ঐ সকল দেশের আধুনিক জীবন পদ্ধতি, ভাষা অর্থনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা খুব সামান্যই আলোকপাত করা হয়। আমরা নিজেদের স্বার্থে অন্তত একটা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে পারি, যেখানে উল্লিখিত বিষয়সমূহ সহ যুগের চাহিদা অনুযায়ী উচ্চ ডিগ্রি প্রদান করা যেতে পারে। তা সম্ভব হলে একদিন দেখা যাবে আজকে আমাদের শিক্ষিত বেকাররাই কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ নিয়ে এসে জাতিকে ধন্য করবে। ধীরে ধীরে দেশ এশিয়ান টাইগারে রূপান্তরিত হবে। মুক্ত বাজার অর্থনীতির এ যুগে বিশ্বে জাতিকে একটা মর্যাদাপূর্ণ স্থানে নিয়ে যেতে আমাদের যুব সমাজকে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পমুখি করে গড়ে তুলতে হবে, চাকরিমুখী নয়।

বিশ্বরাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা বাণিজ্য, শিক্ষা সংস্কৃতি ও সামাজিক পরিবর্তনসহ সব কিছুর উপর আজ তথ্য প্রযুক্তি অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে আজ শুধু কম্পিউটার নয় বরং ল্যাপটপ মোবাইল ফোন ও তথ্য প্রযুক্তি বিশ্বকে হাতের মুঠোই এনে দিয়েছে। আমরা বাস করছি একটা বৈশ্বিক গ্রামে। এটি বিশ্বময় অবারিত সুযোগ সুবিধার দ্বার খুলে দিয়েছে। এ তথ্য প্রযুক্তি বিশ্ব সমাজের জীবনচিত্র তথা অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিতে আমূল পরিবর্তন করছে। এর ছোঁয়া লেগেছে বাংলাদেশেও।

পোশাক শিল্পের কারণেই বাংলাদেশ বিশ্বে অন্যতম প্রধান রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে একটা সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই পোশাকি শিল্পে আজ অশনি সংকেত লক্ষ্য করা যায়। শ্রীলংকার মত রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে বাংলাদেশও বাজার হারাতে বসেছে। গৃহ যুদ্ধের কারণে, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় শ্রীলংকার মত বাংলাদেশও প্রায়শই হরতাল, হত্যা, গুম, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক কাজ লেগেই আছে। ব্যবসায়ীরা হতাশ, বিব্রত, সমগ্র জাতি দিশেহারা, বিদেশিরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। বিনিয়োগকারীরা পুঁজি প্রত্যাহার করে কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম ও পার্শ্ববর্তী ভারতে নিয়ে যাচ্ছে। বিদেশি ক্রেতারা অর্ডার দিতে এসে হতাশ হয়ে অন্য দেশে চলে যাচ্ছে। এটা যদি আরো কিছু কাল চলতে থাকে তবে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বেকার হতে পারে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক এবং মুখ থুবড়ে পড়তে পারে আমাদের অর্থনীতি।

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা

বিশ্বায়নে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের যোগ্য করে তোলার জন্য শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদানে শিক্ষকের ভূমিকা নিম্নরূপঃ

- শিক্ষা বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর মনোসংযোগ স্থাপন করতে হবে;
- শিক্ষার সাথে শিক্ষার্থীর একাগ্রচিত্ততা সৃষ্টি করতে হবে;
- বিশ্বায়নে নতুন নতুন বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবণতা সৃষ্টি করতে হবে। এতে শিক্ষার্থীরা কৌতুহলী ও মননশীলতা সৃষ্টি হবে;
- শ্রেণি পাঠদানে কাজ প্রদান ও আনন্দদায়ক করে তুলতে হবে;
- শিক্ষার্থীদের বিশ্বায়নের গুরুত্ব এবং এর প্রভাবে শিক্ষার পরিবেশ উন্নত হচ্ছে সে সম্পর্কে অবহিত করতে হবে;
- শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ের পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে;
- নতুন জ্ঞানের সাথে পরিচয় ঘটানো এবং শেখার কাজ যাতে দ্রুততম হয় তা উপলব্ধি করতে দেয়া;
- শিক্ষার্থীর কার্যে স্বীকৃতি ও চিন্তার স্বাধীনতা প্রদান করা;
- শৃঙ্খলা আনয়ন ও ভীতি দূরীকরণের উপায় খুজে বের করা;
- শিক্ষার্থীদের মাঝে মুক্ত চিন্তা, মুক্ত মনের প্রকাশ ভঙ্গি সৃষ্টি করা;
- মেধা ও মননশীলতার বৈচিত্রতা আনয়ন করা;
- বিশ্বায়নের প্রভাবে শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে অধ্যবসায়ী মনোভাব জাগ্রতকরণের উপায় খুজে বের করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বিগত প্রায় পাঁচ শত বছর বিশ্ব নিয়ন্ত্রণকারী শক্তির মধ্যে প্রথমে কোনটির উত্থান ঘটেছিল?
ক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
খ. উন্নয়নশীল দেশসমূহ
গ. প্রাচ্য জাতির জোট
ঘ. পাশ্চাত্য জাতি

২. বিশ্বায়নের যুগে প্রতিযোগিতায় কারা টিকে থাকবে?
ক. শক্তিশালীরা
খ. উপযুক্তরা
গ. পশ্চিমারা
ঘ. ধৈর্যশীলরা

উত্তরমালা: ১. ক, ২. খ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বিশ্বায়ন বলতে কী বোঝায়?
২. বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের শক্তিগুলো কি কি?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষার্থীদের যোগ্য করে গড়ে তোলায় একজন শিক্ষকের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

পাঠ- ৫.২: বিভিন্ন ধরনের শিক্ষায় বিশ্বায়নের প্রভাব ও প্রতিবন্ধকতা
Impact of Globalization on Different Types of Education

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ধারা বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষায় বিশ্বায়নের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিশ্বায়নের প্রভাবে শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা উল্লেখ করতে পারবেন।

সাম্প্রতিকালে মিডিয়া জগতে বিশ্বায়ন এক বহুল আলোচিত বিষয়। শুরুতে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহ ছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন প্রকার শিক্ষায় বিশ্বায়নের প্রভাবের ফলে তা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। তবে এখানে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা কী? তা আলোচনা করা দরকার। শিক্ষার প্রকার ভেদ নিম্নরূপ–

১. অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা;
২. আনুষ্ঠানিক শিক্ষা;
৩. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা;
৪. বিশেষ শিক্ষা।

১. **অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা:** যে শিক্ষা নিয়ম-কানুন বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাধ্যবাধকতার নিগড়ে আবদ্ধ নয় এমন শিক্ষাকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বলা হয়। মানুষের জীবনে শিক্ষার সূত্রপাত হয় অনানুষ্ঠানিক ধারার এবং এই প্রক্রিয়া আমৃত্যু অব্যাহত থাকে। অধ্যাপক আবু হামিদ লতিফ বলেছেন, “জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে জীবনব্যাপী দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে মানুষ শুনে, দেখে অনুকরণ করে এবং ঠেকে যা শিখে তাই অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা”। এ শিক্ষার পাঠশালা হচ্ছে পরিবার, সমাজ, প্রকৃতি, লোকাচার, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাস ইত্যাদি। বিশ্বায়নের প্রভাবে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার বাহন হলো– পত্র-পত্রিকা, গণমাধ্যম ও স্যাটেলাইট ইত্যাদি। এতে অপসংস্কৃতির কারণে সঠিক শিক্ষা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

২. **আনুষ্ঠানিক শিক্ষা:** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে শিক্ষার ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায় “স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ধারাবাহিক এবং ক্রম উচ্চস্তরে বিন্যস্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বলে”। আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো থাকে। শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট বয়সে আনুষ্ঠানিক উপায়ে শিক্ষা অর্জন শুরু করে এবং ধারাবাহিকভাবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে থাকে।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য–

- আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শ্রেণিভিত্তিক;
- আনুষ্ঠানিক শিক্ষাস্তর ভিত্তিক;
- এ শিক্ষা পূর্ণকালীন;
- এটি সংগটিত ও সুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থা;

- এটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কাঠামোভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা;
- সুনির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম ও পূর্ব নির্ধারিত পাঠ্য বিষয়ভিত্তিক;
- এ শিক্ষা সার্টিফিকেটমুখী;
- আইন, কানুন, রীতিনীতি ও বিধি নিষেধ দ্বারা এ শিক্ষাব্যবস্থা শৃঙ্খলিত;
- এ শিক্ষাব্যবস্থা প্রধান উপাদান হল শিক্ষক;
- এ শিক্ষা ২য় উপাদান হল শিক্ষার্থী;
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক কর্তৃক সুপ্রতিষ্ঠিত, শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা সীমিত এবং
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ শিক্ষা সাধারন ধর্মী।

বিশ্বায়নের প্রভাবে আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। উন্নয়ন ও উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিনিয়ত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীতে একই ধরনের পরিবর্তন ও পরিমার্জন হচ্ছে। এ পরিবর্তন ও পরিমার্জনের ক্ষেত্রে প্রবিন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এক এক দেশের এক'এক চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

৩. **উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা:** উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা হচ্ছে সেই নমনীয় শিক্ষাব্যবস্থা যা কোনো বিশেষ শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের জন্য গড়ে উঠে। অন্যভাবে বলা যায়, আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অনমনীয় বাধ্যবাধকতা ও নিয়মনীতির বাইরে নির্দিষ্ট একদল শিক্ষার্থীর উপানুষ্ঠানিত শিক্ষা। এ শিক্ষার বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে–

- এ শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য, সময়, শিক্ষাক্রম ও ব্যবস্থাপনার দিক থেকে নমনীয়;
- এ শিক্ষার প্রধানত: ব্যবহারিক, কর্মভিত্তিক, চাহিদাভিত্তিক ও প্রায়োগিক;
- এ শিক্ষা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মত দীর্ঘমেয়াদি নয়, স্বল্প মেয়াদি এবং
- এ শিক্ষা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মত পূর্ণকালীন নয়, খণ্ডকালীন।

৪. **বিশেষ শিক্ষা:** বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় শিক্ষার আয়োজন করাই হলো বিশেষ শিক্ষা। এদের জন্য সাধারণ শিক্ষার সাথে একীভূত শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। এসব শিক্ষার্থীকে মূলধারা শিক্ষাব্যবস্থায় এনে এক সাথে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করাই হলো একীভূত শিক্ষার উদ্দেশ্য। এ জন্য সকল শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, অনুভূতি, বিশ্বাস, ধর্ম, ভাষা বা অন্য কোনো বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বে একই বিদ্যালয়ে আসতে বাধা দেয়া যাবে না। একই বিদ্যালয়ে যাতে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, শ্রমজীবি শিশু, পথশিশু, উপজাতীয় বা ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার শিশু এবং সুবিধা বঞ্চিত বিভিন্ন পরিবারের শিশুরা যাতে শিক্ষা অর্জন করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। তাছাড়া এসব শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাও আছে। এক্ষেত্রে এ শিক্ষা বিশ্বায়নের প্রভাবে একই শিক্ষা ধারার সঙ্গে এসব প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়ন গঠছে।

বিভিন্ন শিক্ষায় বিশ্বায়নের প্রভাবের ফলে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতাসমূহ হচ্ছে–

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাব এবং ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোর নিষ্ক্রিয়তা ও কোথাও কোথাও দ্বন্ধ সংঘাত;
- আন্ত:আঞ্চলিক ও আন্ত:মহাদেশীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে সমন্বয়ের অভাব;
- ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এর ভারসাম্যহীনতা;
- বিশ্বায়নের ধনী রাষ্ট্র ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের ব্যবধান বাড়িয়ে দিয়েছে;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও মনিটরিং ব্যবস্থা দুর্বলতা ও দুনীতি;
- শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাব;

- অবকাঠামো সমস্যা;
- যোগ্য শিক্ষকের অভাব;
- শিক্ষকের অপ্রতুলতা;
- প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার অভাব;
- শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত ও মানসিক প্রস্তুতির অভাব;
- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি আধুনীকরণের অভাব;
- ছাত্র-ছাত্রীদের ভাষা-জ্ঞানের অভাব;
- গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসহ দক্ষ জনবলের অভাব;
- একবিংশ শতাব্দী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ, নতুনতত্ব, ম্যানো প্রযুক্তি, তথ্য প্রযুক্তি, মহাকাশ প্রযুক্তি, জেনেটিক প্রকৌশল, ন্যানো চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব;
- বিশেষ শিক্ষা খাতে অর্থ বরাদ্দ অপ্রতুলনা;
- ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব এবং
- বিশ্বায়নের ফলে অপসংস্কৃতির প্রবেশ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষার ধারা কয়টি?
ক. ২টি
খ. ৩টি
গ. ৪টি
ঘ. ৫টি

২. আনুষ্ঠানিক শিক্ষার উপাদান হল–
i. শিক্ষক শিক্ষার্থী
ii. প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাক্রম
iii. শিক্ষক শিক্ষাক্রম
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i ii ও iii

উত্তরমালা: ১. গ, ২. ক

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে কী বুঝায়?
২. বিশ্বায়নে শিক্ষার ধরনসমূহ লিখুন।
৩. বিশেষ শিক্ষার কাজ কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিশ্বায়নে শিক্ষার ধরন ব্যাখ্যা করুন।
২. বিশ্বায়নের প্রভাবে শিক্ষার প্রতিবন্ধকতাসমূহ লিখুন।

পাঠ ৫.৩: বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে উন্নয়ন ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশনে শিক্ষার উন্নয়নের অগ্রগতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষা উন্নয়নে জাতিসংঘের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষা উন্নয়নে বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের শিক্ষা উন্নয়নে বিশ্বায়নের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।

বিশ্বায়নের উন্নয়ন ও শিক্ষা

বিশ্বায়নের যুগে সমাজ প্রগতি এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষার বিশ্বপ্রেক্ষাপট প্রতিনিয়তই দ্রুততার সঙ্গে বদলে যাচ্ছে, সংযুক্ত হচ্ছে একে অন্যের সঙ্গে। এ যুগে উচ্চশিক্ষা, জ্ঞান দক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশই দিতে পারে দেশ ও জাতিকে সফলতা এবং সভ্যতাকে করতে পারে সর্বাংশে পরিপূর্ণ এবং সকল সমস্যা থেকে মুক্ত হোক সে বৈশ্বিক উষ্ণতা, পরিবেশ দূষণ, জ্বালানী সংকট ও অর্থনীতির অস্থিরতা, রোগ শোক, জরা মৃত্যু, জাতিগত বা উগ্র ধর্মীয় দ্বন্দ্ব সংঘাত ও সহিংসতা। তাই আজকের যুগে উচ্চশিক্ষা এবং দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা যেমন করে অনুভূত হচ্ছে মানব সভ্যতার ইতিহাসে তেমন করে পূর্বে কখনো অনুভূত হয়নি। আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া গতিময় হওয়ার ক্রমধারায় শিক্ষারও বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে রূপ সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এ ধারার সাথে সংগতি রেখে পূর্ণগঠিত হচ্ছে। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার ভূমিকা জোরদারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে চলেছে। সাথে সাথে নানাবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করছে। এসব সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে শিক্ষার উন্নয়ন প্রতিনিয়ত গতিময় করে চলেছে।

বিশ্বায়নে জাতিসংঘ/আন্তর্জাতিক সনদ ও কমিশনের ভূমিকা

বিশ্বায়নে শিক্ষা উন্নয়নে এসব শিক্ষা কমিশন ও সংস্থার প্রধান প্রধান দিকগুলো হচ্ছে–

১. **মানব অধিকারে সর্বজনীন ঘোষণা:** ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের ২১৭ ক (১১১) বিধিতে বিশ্বের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার এক সর্বজনীন ঘোষণা প্রদান করা হয়। এ ঘোষণায় প্রত্যেকেরই শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। প্রাথমিক প্রারম্ভিক ও মৌলিক স্তরসমূহে শিক্ষা অবৈতনিক হতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হতে হবে। কারগরি ও পেশাগত শিক্ষা লাভের সুযোগ সাধারণভাবে সহজলভ্য হবে এবং মেধা অনুযায়ী উচ্চ শিক্ষায় অংশগ্রহণে সকলের সমান সুযোগ থাকবে ।

২. **আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন (১৯৭১-১৯৭২):** জাতিসংঘ শিক্ষা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (ইউনেস্কো) বিশ্ব শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। মানুষ ও সমাজের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার গতি ও প্রকৃতি বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদানে সংস্থাটি জন্মলগ্ন থেকে সূচারুরূপে দায়িত্ব পালন করে আসছে। এ কমিশনের প্রধান দুটি দায়িত্বের মধ্যে প্র মটি হলো দ্রুত পরিবর্তনশীল জ্ঞান রাজ্যে ও সমাজ ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক সমঝোতা ও শান্তির চাহিদার নিরিখে শিক্ষার নতুন নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করা। দ্বিতীয়টি হলো নির্ধারিত উদ্দেশ্যাবলি অর্জনে প্রয়োজনীয় বুদ্ধিবৃত্তিক মানবীয় ও অর্থ বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা। এই কমিশন ১৯৭২ সালে "Learning to Be" (বিকশিত হওয়ার জন্য শেখা) শীর্ষক প্রতিবেদন পেশ করে। বর্তমানে তা অনুসরণ করে চলেছে।

৩. **সিডো সনদ:** নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দূর করা এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) সনদ গৃহীত হয়। এ সনদে শিক্ষার সম অধিকার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিশেষ করে পুরুষ ও নারীর সমতার ভিত্তিতে সেসব বিষয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রসমূহ নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪. **শিশু অধিকার কনভেনশন ১৯৮৯:** ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বিশ্ব শিশু অধিকার সনদ ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণা পত্রের ২৮ ও ২৯ অনুচ্ছেদের শিশুদের শিক্ষার অধিকার উল্লেখ করা হয়েছে। এক কথায় সকল রাষ্ট্র সমান সুযোগের ভিত্তিতে শিশুর শিক্ষা লাভের অধিকারকে স্বীকার এবং বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৫. **সবার জন্য শিক্ষা বিশ্ব ঘোষণা ১৯৯০:** ১৯৯০ সালে ৫ থেকে ৯ মার্চ থাইল্যান্ডের জমতিয়েন এ সবার জন্য শিক্ষা বিষয়ক বিশ্ব ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণায় সার সারমর্ম হলো–

ক. মৌলিক শিক্ষার চাহিদা পূরণ;
খ. দৃষ্টিভঙ্গি গঠন;
গ. সর্বজনীন সুযোগ সৃষ্টি ও সমতা বিস্তৃত;
ঘ. শিক্ষা অর্জনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান;
ঙ. মৌলিক শিক্ষার পদ্ধতি ও পরিধি বিস্তৃতকরণ;
চ. শিক্ষার পরিবেশ উন্নতকরণ;
ছ. অংশীদারীত্ব শক্তিশালীকরণ;
জ. প্রাসঙ্গিক সমর্থন-নীতিমালা গঠন;
ঝ. সম্পদ সংগ্রহ এবং
ঞ. আন্তর্জাতিক সংহতি দৃঢ়করণ।

৬. **দিল্লী ঘোষণা ১৯৯৩:** ১৯৯৩ সালে ১৬ ডিসেম্বর দিল্লীতে উচ্চ জনসংখ্যার নয়টি উন্নয়নশীল দেশের (বাংলাদেশ, ব্রাজিল, চীন, মিশর, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া ও পাকিস্তান) প্রতিনিধিরা একটি সম্মেলনে মিলিত হয়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন ও সকল নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে দিল্লী ঘোষণা প্রদান করে। এ ঘোষণা ১৯৯০ সালে সবার জন্য শিক্ষা' বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলন এবং বিশ্ব শিশু সম্মেলনে নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ যথাসাধ্য উৎসাহ উদ্দীপনা ও সকল্প নিয়ে বাস্তবায়নে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

৭. **একুশ শতকে শিক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক কমিশন (১৯৯৩–১৯৯৬):** ইউনেস্কো ১৯৯৩ সালে ফ্রান্সের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি ও ইউরোপীয় কমিশনের প্রাক্তন সভাপতি জ্যাক দেলর কে চেয়ারম্যান করে একুশ শতকে শিক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক কমিশন নিয়োগ করে। এটি দেলর কমিশন নামে পরিচিত। এ কমিশনে বিভিন্ন দেশের মোট পনের জন শিক্ষা বিশেষজ্ঞ সদস্য ছিলেন। ১৯৯৬ সালে এ কমিশন ইউনেস্কোর নিকট “Learning: The Treasure Within” (শিখন: অন্তর্নিহিত সম্পদ) শীর্ষক রিপোর্ট প্রদান করে। আন্তর্জাতিক এ শিক্ষা কমিশন একুশ শতকে শিক্ষার বিশ্ব চাহিদার প্রেক্ষিতে কতকগুলো ক্ষেত্র নিরূপন করে। এ গুলো হচ্ছে– (ক) শিক্ষা ও উন্নয়ন (খ) শিক্ষা ও বিজ্ঞান (গ) শিক্ষা ও নাগরিকতা (ঘ) শিক্ষা ও সংস্কৃতি (ঙ) শিক্ষা ও সামাজিক সুসংগতি (চ) শিক্ষা ও কাজ।

৮. **বিশ্ব শিক্ষা ফোরাম ২০০০:** সেনেগারে রাজধানী ডাকারে ২০০০ সালে বিশ্ব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা “সবার জন্য শিক্ষা” নীতি বাস্তবায়নে একটি ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করেন। এটি The Dakar

Framework for Action (DFA) ঘোষণা নামে পরিচিত। সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ শিশু, সুবিধাবঞ্চিত শিশু, মেয়ে শিশু, সংখ্যালঘু শিশুসহ সকল শিশুর জন্য ২০১৫ সালের মধ্যে বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক ও মান সম্পন্ন শিক্ষার নিশ্চয়তা বিধান। এ লক্ষ্যে ছয়টি লক্ষ্য নির্ধারণ এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য বারটি কৌশল নির্ধারণ করে।

৯. **সহস্রাব্দ ঘোষণা ২০০০:** নতুন সহস্রাব্দ শুরুর প্রস্তুতি হিসেবে ১৯৯০ দশকে জাতিসংঘের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্ব মানব সমাজের বিভিন্ন দিক বিশেষত টেকসই সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিষয়াদি নিয়ে সংলাপ সেমিনার, সম্মেলন ইত্যাদি পরিচালনা করে। বিশ্বভিত্তিক মানব উন্নয়ন সাধনে একটি বিশ্ব অংশীদারত্ব ব্যবস্থা সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতি লাভ করে। এ প্রক্রিয়ায় বিশ্বের দেশে দেশে ৮টি উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। এই লক্ষ্যসমূহ (The Millennium Development Goals (MDGs) নামে খ্যাতি। এসব লক্ষ্যের ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রক্রিয়া পরিচালনায় জন্য ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘভুক্ত দেশগুলো সর্বসম্মতিক্রমে "সহস্রাব্দ ঘোষণা" (The Millennium Declaration) গ্রহণ করে। এসব লক্ষ্যের মধ্যে ২ ও ৩ নম্বরের লক্ষ্যমাত্রা সরাসরি শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত।

২ নং লক্ষ্যমাত্রা– ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বের সর্বত্র বালক বালিকা, সকলের প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্ত করার নিশ্চয়তাবিধান। ৩নং লক্ষ্যমাত্রা শিক্ষার সকল স্তরে লিঙ্গ বৈষম্যদূরীকরণ।

আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ অন্যান্য সংস্থার শিক্ষা কর্মসূচী

জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা বিশেষত ইউনেস্কো, ইউনিসেফ, ইউএনডিপি বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার বিভিন্ন দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। এ ক্ষেত্রে এসব সংস্থা ইস্যুভিত্তিক শিক্ষা এবং শিক্ষা উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে চলেছে। উন্নয়নশীল দেশসমূহ দিন দিন শিক্ষা উন্নয়নে অগ্রগতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইক) Overseas Development Assistance (ODA)-এর ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের শিক্ষাসহ উন্নয়ন কর্মসূচীতে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে চলেছে।

সেভ দি চিলড্রেন (ইউএসএ) সংস্থাটি শিশু ও পরিবারের উন্নয়নে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কর্মসূচী পরিচালনা করে চলেছে। শিক্ষা কর্মসূচিতে প্রাথমিক শৈশবকালীন বিকাশ কর্মসূচীর আওতায় সংস্থাটি 'বাড়িভিত্তিক প্রারম্ভিক শিক্ষা সুযোগ কেন্দ্র' (Home Based Early Learning Opportunity Centres –HBELOC) এবং 'বাড়িভিত্তিক প্রাক্ বিদ্যালয়' (Home Based Pre-Schools-HBPS) পরিচালনা করে। এসব ব্যবস্থায় শিশুদের জন্য ঘরে ও বাইরে খেলা, ছড়া, গান এবং গল্প বলার অয়োজন করা হয়। শিশুদের পিতা-মাতা এবং শিশু যত্নকারীদের প্রশিক্ষণ ও দেয়া হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীতে ৬-১৫ বছর বয়সী বিদ্যালয় বহির্ভূত ও বিদ্যালয় অন্তভর্ক্তু শিশুদের (In and out of school children) জন্য প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের জন্য অগ্রবর্তী শিশুদের সহায়তায় শিশু থেকে শিশু (Child to Child) কৌশল অবলম্বনে শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি কর হয়। শিশুদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টির জন্য 'লোককেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। একেন্দ্রে শিশুদের জন্য বই ও পত্রপত্রিকা পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

বাংলাদেশের শিক্ষা ও উন্নয়ন

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আরো অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে চলেছে। এসব সংস্থা দেশগুলোর সরকার এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও বেসরকারী সংস্থার সাথে অংশীদারত্বমূলক সমঝোতার ভিত্তিতে শিক্ষার বিভিন্ন কর্মসূচী পরিচালনা ও সহায়তা প্রদান করছে।

উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান, কাঙ্খিত উৎকর্ষ সাধন, শিক্ষাক্রমের আধুনিকায়ন, বিষয়ে বৈচিত্র আনয়ন, শিক্ষকদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নবতর জ্ঞানের দিগন্ত উন্মোচন, বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সংগ্রামে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে প্রস্তুতকরণে উচ্চ শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা অনস্বীকার্য। একবিংশ শতাব্দীর এ লগ্নে বর্তমান সরকারের "রূপকল্প ২০২১ (Vision 2021)" অর্জনে এবং বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তীকালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক, দারিদ্র ও ক্ষুধামুক্ত জাতি হিসেবে গড়ার যে স্বপ্ন রয়েছে তা বাস্তবায়নে উচ্চ শিক্ষার ভূমিকা অগ্রগণ্য। গুণগত মানসম্পন্ন সড়বাতকরাই পারে সরকারের এ লক্ষ্য অর্জনকে ত্বরান্বিত করতে। "রূপকল্প ২০২১ (Vision 2021)" বাস্তবায়নে দক্ষ জনশক্তি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন মুক্ত মনের আলোকিত এবং নিবেদিত প্রাণ মানবসম্পদের কোন বিকল্প নেই। আর গুণগত মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ই পারে সেই মানের মানবসম্পদ সৃষ্টি করতে এবং বাংলাদেশের কাঙ্খিত সোনার বাংলায় পৌছে দিতে।

মানুষের উদ্ভাবনী চিন্তার প্রসার এবং তা বাস্তবায়নের ধারায় জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জগতে দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। সমাজের বিভিন্ন ধারার সাথে এসব কিছুর কার্যকারণ ও ফলাফলের ভিত্তিতে মানব সমাজ দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। সাথে সাথে মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন নতুন নতুন মাত্রা লাভ করছে। এসব মাত্রা পূরণে শিক্ষার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ক্রমেই বহুমাত্রিক রূপ লাভ করছে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রতিটি দেশের শিক্ষানীতি ও পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়ন কেবল দেশীয় দৃষ্টিকোণের মধ্যে গন্ডিবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। শিক্ষার বিশ্বপরিপ্রেক্ষিত এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। বাংলাদেশে শিক্ষার সকল ক্ষেত্রেই এ পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনায় রেখে অন্যান্য কার্যক্রম ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য।

উপসংহার

আন্তর্জাতিক শিক্ষ কমিশন ও আন্তর্জাতিক সংস্থা বিভিন্ন কর্মসূচীর ফলে উন্নয়নশীল দেশসমূহে শিক্ষার উন্নয়ন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বায়নের ফলে এক দেশের শিক্ষাব্যবস্থা অন্য দেশের শিক্ষাব্যবস্থার তুলনামূলক পর্যালোচনা ও আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার উন্নয়নের গতিময় করে তুলছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সবার জন্য শিক্ষা কত সালে ঘোষণা করে?

ক. ১৯৮৮
খ. ১৯৮৯
গ. ১৯৯০
ঘ. ১৯৯১

২. একুশ শতকে শিক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক কমিশনের সভাপতি কোন দেশের?

ক. চীন
খ. ফ্রান্স
গ ভারত
ঘ যুক্তরাষ্ট্র

উত্তরমালা: ১। গ, ২। খ

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশনে মূল বক্তব্য কী?
২. বিশ্ব শিক্ষা ফোরাম– ২০০৩-এর বৈশিষ্ট উল্লেখ করুন।
৩. সবার জন্য শিক্ষা বিষয়ক ঘোষণার উপদানসমূহ লিখুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা উন্নয়নে আন্তর্জাতিক শিক্ষা কশিশনসমূহের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।
২. বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে শিক্ষার উন্নয়নের একটি প্রতিবেদন তৈরি করুন।

পাঠ ৫.৪: জ্ঞান, দক্ষতা ও আবেগের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- জ্ঞানের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
- দক্ষতার শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আবেগের শ্রেণিকরণ করতে পারবেন।

বর্তমান বিশ্বে শিক্ষাক্রম প্রণেতাগণ ব্লুমের Taxonomy অনুসরণ করে শিক্ষার উদ্দেশ্য শ্রেণিকরণ করে থাকেন। তিনি উদ্দেশ্যগুলোকে তিনভাগে ভাগ করেছেন– জ্ঞান সম্বন্ধীয় উদ্দেশ্য, অনুভূতিমূলক উদ্দেশ্য এবং মনোপেশীজ উদ্দেশ্য। জ্ঞান, মানসিক দক্ষতা ও তার প্রয়োগ, মূল্যায়ন ইত্যাদিকে জ্ঞান বিষয়ক উদ্দেশ্য বলা হয়। এই জ্ঞান বিষয়ক উদ্দেশ্যকে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। অনুভূতিমূলক উদ্দেশ্য হল কোন বিষয় গ্রহণ, বর্জন, পছন্দ, অপছন্দ, অনুভূতি এবং আবেগের মাত্রা ইত্যাদি নির্দেশ করা। যে কার্য মন ও পেশীয় সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হয় তাকে মনোপেশিজ উদ্দেশ্য বলা হয়। কোনো একটি পাঠ শেষে শিক্ষার্থী কী জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে সে সম্পর্কে পূর্ব নির্ধারিত সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বাক্য হল শিখণফল। শিখনফলের ওপরভিত্তি করে লেখা হয় প্রতিটি পাঠের বিষয়বস্তু, শিখনফল সুনির্দিষ্ট, স্পষ্ট ও পরিমাপযোগ্য হবে এবং বলা, বর্ণনা করা, লেখা, পার্থক্য করা, প্রদর্শন কর এ ধরনের সকর্মক ক্রিয়াপদ (Action verb) ব্যবহার করে লিখতে হবে। বিশ্বায়নের প্রভাবে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাবের পরিবর্তন আনয়নে শিখন-শেখানোর কৌশল আধুনিকরণ করে চলেছে। এতে শিক্ষার্থীরা অন্যদেশে শিক্ষাব্যবস্থা অনুশীলন করতে বিশ্বায়ন সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

জ্ঞান সম্বন্ধীয় উদ্দেশ্য (Cognative Objective)

জ্ঞান, মানসিক দক্ষতা ও তার প্রয়োগ, মূল্যায়ন ইত্যাদিকে জ্ঞান বিষয়ক উদ্দেশ্য বলা হয়। এই জ্ঞান বিষয়ক উদ্দেশ্যকে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নিচে সেগুলো সংক্ষেপে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হল:

ক. জ্ঞান (Knowledge): পূর্বে গঠিত কোন বিষয় স্মরণ করা, কোন তথ্য মনে রাখা, কোন প্রক্রিয়া জানা ইত্যাদি এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। যেমন– জনমিতির সাধারণ পদগুলো জানা।

খ. উপলব্ধি (Comprehension): কোন কিছু ভালোভাবে বুঝতে পারা, ব্যাখ্যা করতে পারা এবং নিজের ভাষায় সংক্ষেপে প্রকাশ করতে পারা, বিন্যস্ত করতে পারা ইত্যাদি এর অন্তর্ভূক্ত। যেমন– জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারা।

গ. প্রয়োগ (Application): বুঝে শুনে কোন অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, কৌশল সুনির্দিষ্ট/বাস্তব অবস্থায় তা প্রয়োগ করতে পারা। যেমন– স্থূল জন্মহার নিরূপণের সূত্র জানা এবং তা জন্মহার নির্ণয়ে তা ব্যবহার করতে পারা।

ঘ. বিশ্লেষণ (Anylysis): কোন বিষয়ের বিভিন্ন অংশ জানা এবং তা বিশ্লেষণ করতে পারা। যেমন– নির্ভরশীল জনসংখ্যা বলতে কি বুঝায় তা বিশ্লেষণ করতে পারা।

ঙ. সংশ্লেষণ (Synthesis): কোন বিষয়ের বিভিন্ন অংশগুলোকে সংযোজন/সমন্বয় করতে পারা। যেমন– বিচ্ছিন্নভাবে প্রদত্ত বিভিন্ন আদমশুমারির তথ্য ধারাবাহিকভাবে সাজাতে পারা।

চ. মূল্যায়ন (Evaluation): কোন বিষয়, ধারণা বা তত্ত্বের গুণাগুণ সঠিকভাবে বিচার করতে পারা। যেমন– ঢাকা শহরে গত দশ বছরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান নিয়ামকসমূহ যাচাই করা।

অনুভূতিমূলক উদ্দেশ্য (Affective Objective)

এই উদ্দেশ্য হল কোন বিষয় গ্রহণ, বর্জন, পছন্দ, অপছন্দ, অনুভূতি এবং আবেগের মাত্রা ইত্যাদি নির্দেশ করা। এই উদ্দেশ্যকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি সংক্ষেপে উদাহরণসহ ধারাবাহিকতভাবে আলোচনা করা হল:

ক. **গ্রহণ করা (Receiving):** কোন বিষয়, বক্তব্য, বাণী, ঘটনা মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করা। যেমন– জনসংখ্যা শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধটি মনোযোগ সহকারে পড়া।

খ. **প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা (Responding):** কোন বিষয়, বস্তু, ঘটনা সম্পর্কে ইতিবাচক/নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা। যেমন– স্বেচ্ছায় জনসংখ্যা শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা।

গ. **গুরুত্ব প্রদান (Valuing):** কোন ঘটনা, বিষয়, কার্যক্রমের গুণ বিচার বিশ্লেষণ করার পর গ্রহণযোগ্য হলে এর প্রতি অনুকূল আচরণ করা। যেমন– জীবন যাত্রার গুণগত মান উন্নয়নে জনসংখ্যা শিক্ষা একটি কার্যকর প্রকল্প। এর উদ্দেশ্য অর্জনে সকলকে উদ্বুকরণে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।

ঘ. **সংগঠিত করা (Organizing):** সংগঠন হল বিভিন্ন মূল্যবোধের বৈরিতা দূর করে সকলকে একত্রিত করা। যেমন– বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের এক নম্বর সমস্যা তার স্বীকৃতি দেওয়া এবং সমাধানের কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

ঙ **মূল্যবোধ ভিত্তিক বৈশিষ্ট্য (Characterizing):** প্রত্যেকের নিজস্ব মূল্যবোধ রয়েছে যা তার আচরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তী সময়ে তা অভ্যাসে পরিণত হয়। যেমন– ঝামেলা এড়িয়ে চলে– তাই ভীড়ে চলাচল করে না।

মনোপেশীজ উদ্দেশ্য (Psychomotor Objective)

যে কার্য মন ও পেশীর সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হয় তাকে মনোপেশিজ উদ্দেশ্য বলা যায়। এ উদ্দেশ্যটি শিক্ষার্থীর দক্ষতা অর্জনে নির্দেশ করে। যেমন–

(১) বিজ্ঞানের ব্যবহারিক কাজ, (২) কৃষি শিক্ষায় হালচাষ দিয়ে জমি তৈরি, (৩) বৃত্তিমূলক শিক্ষায়– সেলাই মেশিন মেরামত করা ইত্যাদি। মনোপেশিজ দক্ষতাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ক. **অনুকরণ (Imitation):** যে সকল কাজ করতে গিয়ে পেশীর সমন্বয়ের প্রয়োজন হয় না। কেবল মন কিংবা পেশীর দ্বারা করা সম্ভব হয়।

খ. **হাতের কাজ (Manipulation):** আদেশ অনুসারে অথবা নির্দেশনা মোতাবেক কাজ সম্পন্ন করা।

গ. **খুটিনাটি কাজ নিখুঁতভাবে করা (Precision):** দ্রুত ও নিখুতভাবে কাজ সম্পন্ন করা।

ঘ. **গ্রন্থনা (Articulation):** বিভিন্ন কার্যাদির মধ্যে ধারাবাহিকভাবে সমন্বয় সাধন করা।

ঙ. **স্বভাবজাকরণ (Naturalization):** প্রতিনিয়ত অনুশীলন করতে করতে স্বভাবে পরিণত হওয়ার ফলে পরবর্তী সময়ে তা স্বয়ংক্রিয় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে থাকে। কেজামিন ব্লুম তাঁর সহকমীগণ এক পরীক্ষা কমিটিতে শিক্ষার্থীর অর্জিত শিখন দক্ষতার গুণগতমান উন্নয়ন এর উপর কাজ করার সময় শিখন উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেন। পরবর্তীতে ড. মেগি, ড. ডেভিড কার্থওয়াল আবেগিক ক্ষেত্রের দক্ষতা এবং ড. সিমসন ও ড. ডেভ মনোপেশীজ ক্ষেত্রের দক্ষতা নির্ধারণ করেন। আজ সারা বিশ্বে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন ব্যবস্থায় Bloom's Taxonomy ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও এসবিএ Bloom's Taxonomy থেকে উদ্ভাবিত। তাছাড়া শিক্ষাব্যবস্থা সম্প্রসারণে বিশ্বায়নের ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন দিন দিন বৃদ্ধি হচ্ছে। উন্নত দেশগুলো অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে এসেছে। বিশ্বায়নের ফলে একদেশ থেকে অন্যদেশে মেধাবীরা পড়া-লেখার সুযোগ পাচ্ছে। উন্নত প্রযুক্তির সাথে দিন দিন পরিচিত

হচ্ছে। এতে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশে বিশ্বায়নের প্রভাবে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও আবেগের পরিবর্তন হচ্ছে এবং শিক্ষার হার ও গুণগতমান বাড়ছে।

উপসংহার

বিশ্বায়নের প্রভাবে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার নতুন নতুন দিক নির্দেশনা সংযোজন করে চলেছে। এতে বিশ্বের এক দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পরিবেশ অন্য দেশের শিক্ষার পরিবেশের সাথে সমন্বয় সাধন করে চলেছে। এতে উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. জ্ঞান বিষয়ক উদ্দেশ্যকে কত ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
   ক. ৪
   খ. ৫
   গ. ৬
   ঘ. ৭

২. যে কার্স মন ও পেশীর সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করে তা হলো−
   ক. জ্ঞান
   খ. দক্ষতা
   গ. আবেগ
   ঘ. মনোভাব

উত্তরমালা: ১। গ, ২। খ

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জ্ঞানের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করুন।

২. আবেগকে ক'ভাগে বিভক্ত করা যায় ও কি কি?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. উদাহরণসহ জ্ঞানের উপবিভাগ ব্যাখ্যা করুন।

২. দক্ষতার শ্রেণিবিভাগ উল্লেখপূর্বক শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।

৩. বিশ্বায়নের প্রভাবে জ্ঞান, দক্ষতা ও আবেগে কতটুকু পরিবর্তন হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন? এর স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

পাঠ- ৫.৫: জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অভিপ্রয়াণ এবং নগরায়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- জনসংখ্যার গুরুত্ব বলতে পারবেন।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।
- অভিপ্রয়াণের ধরন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নগরায়ন সম্পর্কে সম্যকভাবে ধারণা প্রদান করতে পারবেন।

জনসংখ্যা (Population)

জনসংখ্যা যে কোন দেশের বড় সম্পদ। জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক তথা সার্বিক উন্নয়ন। তাই বলা যায় জনসংখ্যা ও উন্নয়ন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ১৬৫০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ কোটি। ১৮০৪ সালে এ জনসংখ্যার পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটি, ১৯২৭ সালে প্রায় ২০০ কোটি এবং ১৯৭৪ সালে হয় প্রায় ৪০০ কোটি। ১৯৯৯ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে পৌঁছায় প্রায় ৬০০ কোটিতে। বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যা ৭৩০ কোটির অধিক (২০১৫) জনসংখ্যার এ ধরনের বৃদ্ধিকে বলে 'জনসংখ্যা বিস্ফোরণ'। বিশ্বের এ জনসংখ্যার বেশিরভাগ রয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। সাধারণত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও বেশি। জাতিসংঘের বিশ্ব জনসংখ্যা সমীক্ষা– ২০১৫ অনুসারে গত ১০ বছরে বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১.২৪। বর্তমানে এ বৃদ্ধির হার হয়েছে ১.১৮।

নিচে বিশ্বের কয়েকটি দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেয়া হল

বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (%)

দেশ	১৯৬১ সাল	২০১৫সাল	দেশ	১৯৬১ সাল	২০১৫ সাল
অস্ট্রেলিয়া	২.০	১.৩	ফ্রান্স	১.৩	০.৫
অস্ট্রিয়া	০.৫	০.৮	ব্রাজিল	৩.০	০.৯
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	১.৭	০.৮	বাংলাদেশ	২.৮	১.২
ইন্দোনেশিয়া	২.৬	১.২	ভারত	২.০	১.২
ইরান	২.৬	১.২	মালদ্বীপপুঞ্জ	২.৭	২.০
ইরাক	২.৫	৩.২	মালয়েশিয়া	৩.২	১.৪
কানাডা	২.০	০.৯	মিশর	২.৭	২.১
কুয়েত	১১.৮	৩.৬	মেক্সিকো	৩.১	১.৩
চীন	১.০	০.৫	মায়ানমার	২.২	০.৯
জাপান	২.৬	০.১	যুক্তরাজ্য	০.৮	০.৮
জার্মানি	০.৮	০.৫	রাশিয়া	১.১	০.২
দক্ষিণ আফ্রিকা	৩.১	১.৬	শ্রীলংকা	২.৭	০.৯
নেপাল	১.৬	১.২	সিংগাপুর	৩.৩	১.২
পাকিস্তান	২.৪	২.১	সৌদি আরব	৩.২	২.১

উৎস: ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপ, ২০১৬

দেখা যায়, উন্নয়নশীল দেশ অপেক্ষা বেশিরভাগ উন্নত দেশ সমূহে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম। এ কারণে উন্নত বিশ্বের জনগণ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। শিক্ষার প্রসার, মাথাপিছু আয়, উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি, পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সংক্রামক রোগ ও মহামারী প্রতিরোধ, প্রতিষেধক আবিষ্কার, নিরাপদ খাবার পানি, নবজাতক ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুব্যবস্থা থাকায় উন্নত দেশের জনগণ মানসম্পন্ন জীবনযাত্রা নির্বাহ করে কিন্তু উন্নয়নশীল বেশিরভাগ দেশগুলোর অবস্থা এর বিপরীত।

নিচে বিশ্বের উচ্চ জনসংখ্যা বিশিষ্ট দেশগুলোর পরিমাণ দেয়া হল–

বিশ্বের জনসংখ্যা (জুন, ২০১৬)

দেশ	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)
চীন	১,৩৭৮
ভারত	১,২৬৬
যুক্তরাষ্ট্র	৩২৪
ইন্দোনেশিয়া	২৫৯
ব্রাজিল	২০৬
পাকিস্তান	১৯২
নাইজেরিয়া	১৮৭
বাংলাদেশ	১৬৩
রাশিয়া	১৪৭
জাপান	১২৭

উৎসঃ www.internetworldstats.com#stats8.htm

এভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হলে ২০৫০সালে হবে প্রায় ৯.৯ বিলিয়ন। জাতিসংঘ সমীক্ষা অনুসারে জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলাদেশের স্থান অষ্টম। সমীক্ষায় আরও বলা হয়, আগামী দশকগুলোতে বর্তমানের জনসংখ্যা বহুল দেশগুলোর পরিবর্তন দেখা যাবে এবং বৃদ্ধির হার প্রধানত নয়টি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, যথা ভারত, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, কঙ্গো, ইথিওপিয়া, তাঞ্জানিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া ও উগান্ডা।

জনসংখ্যা বেশির কারণে জনগণ প্রতিনিয়ত নানা সমস্যায় পতিত হয়। বর্তমানে এসব সমস্যা লাঘব করার উদ্দেশ্যে সমগ্র বিশ্বে জনসংখ্যাকে কেন্দ্র করে“জন বিজ্ঞান” বা “Demography” বিষয়টির প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। জন্ম, মৃত্যু, স্থানান্তর, বয়স কাঠামো, সঞ্চয়, প্রাকৃতিক সম্পদ, কর্মস্থান ও বিনিয়োগ প্রভৃতির সাথে জনসংখ্যার সম্পর্ক, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা ও সমাধান ইত্যাদি জনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। দেশের কল্যাণের জন্য জনসংখ্যাকে কাজে নিয়োজিত করার জন্য প্রয়োজন জনবিজ্ঞান অনুশীলন। মূলতঃ জনবিজ্ঞান অনুশীলন ব্যতিরেকে কোন দেশের পক্ষে জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান করা সম্ভবপর নয়।

অপরদিকে শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণ জনসংখ্যাজনিত অনাকাঙ্খিত সমস্যা সমাধান করার লক্ষ্যে মানব জ্ঞানের একটি নূতন শাখার প্রসার ঘটিয়েছেন যা ‘জনসংখ্যা শিক্ষা’ বা “Population Education” নামে পরিচিত। বিষয়টি প্রচলনের পর সফলতা লাভ করায় শুরু হয়েছে বিভিন্ন ধরনের জনসংখ্যা শিক্ষা কার্যক্রম।

দেশের জনসংখ্যার বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, সমাধানের জন্য জনগণের মাঝে মূল্যবোধ সৃষ্টি প্রভৃতি জনসংখ্যা শিক্ষা বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ মানুষের প্রতিনিয়ত কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত যে সব উপাদান যেমন– প্রাকৃতিক, সামাজিক. সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতির প্রভাবে সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে জ্ঞান

অর্জনের বিষয়কে জনসংখ্যা শিক্ষা বলা হয়। ইউনেস্কো ওয়ার্কশপ– আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত জনসংখ্যা শিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়, "উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক নীতিমালা তথা সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকান্ড রূপায়নে সহায়ক শিক্ষার ধারণাই হল জনসংখ্যা শিক্ষা"। গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি আমাদের দেশের মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচিতে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি (Population Growth)

কোন দেশের মোট জনসংখ্যার মৃত্যু হারের চেয়ে জন্ম হার অধিক হলে অথবা বহির্গমন অপেক্ষা বহিরাগমনের পরিমাণ বেশি হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা বোঝায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি যে কোন দেশের জন্য ক্ষতিকর দিক। তবে জনসংখ্যাকে যদি জনসম্পদে পরিণত করা যায় এবং সম্পদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যা আকারে পরিণত হয় না। জনসংখ্যা বৃদ্ধি শতকরা হিসেবে নির্ণয় করা হয়।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি

বাংলাদেশ জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বে অষ্টম স্থানের অধিকারী। আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যার পরিমাণ অনেক বেশি। বলা যায় এদেশে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটেছে। বর্তমানের এখানে প্রায় ১০১৫ জন মানুষ বাস করে। এ কারণে বাংলাদেশ বিশ্বে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর একটি। ফলশ্রুতিতে এদেশ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ সরকার জনসংখ্যা জনিত সমস্যাকে এক নম্বর জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

নিচে বাংলাদেশের জনসংখ্যার পরিমাণ ও বৃদ্ধির হার দেয়া হল।

বছর	মোট জনসংখ্যা (কোটি)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (%)
১৯৭৪	৭.৬৪	২.৪৮
১৯৮১	৮.৯৯	২.৩৫
১৯৯১	১১.১৪	২.১৭
২০০১	১২.৯৩	১.৪৮
২০০৪	১৩.৫২	১.৫
২০১১	১৫.২	১.৩৭
২০১৫	১৫.৭৯	১.৩৬

উৎস: বাংলাদেশ আদমশুমারী রিপোর্ট ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১, ২০১১ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা

প্রতীয়মান যে, বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পূর্বের ন্যায় বৃদ্ধি না হয়ে মন্থর গতিসম্পন্ন হয়েছে। শিক্ষার অভাব, বহুবিবাহ, বাল্য বিবাহ, খাদ্যাভ্যাস, পুত্র সন্তানের চাহিদা, জন্মহার ও মৃত্যুহারের ব্যবধান, মৃত্যুহার হ্রাস, বৃদ্ধ বয়সের নিরাপত্তা, বসতি স্থানান্তর প্রভৃতি জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপসমূহ

বাংলাদেশের জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও অসমাঞ্জস্য হওয়ায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

সরকারি পদক্ষেপ

১. শিক্ষার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ এবং সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ।

২. নারী শিক্ষার প্রসরে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ এবং ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান।
৩. পরিবার ছোট (দুটি সন্তান) রাখার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কার্যক্রমের প্রচলন।
৪. কাজী অফিসে রেজিস্ট্রেশনের উপর পদক্ষেপ গ্রহণ।
৫. চাকুরির ক্ষেত্রে নারীদের নিয়োগ দানের জন্য কোটা প্রথা প্রবর্তন।
৬. মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ বছর নির্ধারণ।

বেসরকারি পদক্ষেপ

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তার্জাতিক পর্যায়ের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে,

১. বাল্যবিবাহ রোধে ভূমিকা গ্রহণ।
২. পরিকল্পিত পরিবার গড়ার জাতীয় লক্ষ্য বাস্তবায়নে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিগ্রহণে উদ্যোগ গ্রহণ।
৩. কমিউনিটিভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পের আওতায় পরিবার ছোট রাখার উদ্দেশ্যে শিক্ষা ও পরামর্শ দেয়া এবং টিকা, ইনজেকশন ও পুষ্টি বিষয়ে সেবা প্রদান।
৪. জনসংখ্যা সীমিত রাখার জন্য সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনাকরণ।
৫. ধর্মীয় নেতাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ভূমিকা গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ।

অভিপ্রয়াণ (Migration)

অভিপ্রয়াণ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Migration. ল্যাটিন শব্দ Migrate থেকে ইংরেজি Migration শব্দের উৎপত্তি যার আভিধানিক অর্থ To Travel বা ভ্রমণ। তবে বর্তমানে অভিপ্রয়াণ শব্দটি শুধুমাত্র ভ্রমণ বা স্থান পরিবর্তন করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। কোন উদ্দেশ্যে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য এক স্থান ত্যাগ করে অন্য স্থানে গমন করাকে অভিপ্রয়াণ বোঝানো হয়।

বহু যুগ ধরে অভিপ্রয়াণের প্রথা প্রচলিত। বিভিন্ন প্রয়োজনে মানুষ স্থান ত্যাগ করে অন্য স্থানে বসতি স্থাপন করে।

অভিপ্রয়াণের কারণ

অভিপ্রয়ানের বহুবিধ কারণ বর্তমান। উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ হলো–

- অর্থনৈতিক গতিশীলতা
- পেশাগত চাহিদা
- উন্নত শিক্ষার আকর্ষণ
- পারিবারিক চাহিদা
- জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
- উন্নত পরিবেশ
- নাগরিক সুযোগ সুবিধা
- সন্তানের নিরাপত্তা
- উচ্চাকাঙ্খা
- সামাজিক দায়বদ্ধতা
- নিরাপদ ভবিষ্যত

অভিপ্রয়াণের ধরন

অভিপ্রয়াণের কতিপয় ধরন নিচে বর্ণনা করা হল

১. **অভ্যন্তরীণ অভিপ্রয়াণ বা Internal Migration:** কোন দেশ, রাজ্য বা মহাদেশের মধ্যে বসবাসের উদ্দেশ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করাকে অভ্যন্তরীণ অভিপ্রয়াণ বলে।

২. **বহিঃস্থ অভিপ্রয়াণ বা External Migration:** কোন ব্যক্তি যদি নিজ দেশ থেকে ভিন্ন রাজ্য, দেশ বা মহাদেশে বসবাসের উদ্দেশ্যে যায়তবে তাকে বহিঃস্থ অভিপ্রয়াণ বলে।

৩. **প্রত্যাবর্তন অভিপ্রয়াণ বা Return Migration:** যখন মানুষ কোন উদ্দেশ্যে অন্য দেশ বা অঞ্চলে যেয়ে বসবাস করে এবং পরবর্তীতে নিজের সুবিধা অনুযায়ী আবার পূর্বের স্থানে ফিরে আসে তখন প্রত্যাবর্তন অভিপ্রয়াণ বলা হয়।

৪. **মৌসুমি অভিপ্রয়াণ বা Seasonal Migration:** যদি নির্দিষ্ট কোন সময়ে নিজের প্রয়োজনে অন্য স্থানে বসবাস করে ও পরবর্তীতে নির্দিষ্ট সময়ে পূর্বোক্ত স্থানে ফিরে আসে এবং এ যাওয়া-আসা যদি চলমান রাখে তবে তা মৌসুমি অভিপ্রয়াণ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। সাধারণত শ্রমজীবিদের ক্ষেত্রে এ ধরনের অভিপ্রয়াণ প্রযোজ্য।

৫. **দেশান্তর বা Emigration:** স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য নিজ দেশ ত্যাগ করে বিশ্বের যে কোন দেশে যায় তখন দেশান্তর বুঝায়। যারা দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে যেয়ে বসবাসের অধিকারী হয়, তাদেরকে Emigrant বলে। যেমন ইংল্যান্ড থেকে তীর্থ যাত্রীরা ১৬২০ সালে আমেরিকায় বসতি স্থাপন করেছিলেন।

৬. **অভিবাসন বা Immigration:** নিজ দেশথেকে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে অন্য কোন দেশে প্রবেশ করলে অভিবাসন বুঝানো হয়। যে ব্যক্তি নূতন দেশে অভিবাসনের উদ্দেশ্যে যায় তাকে Immigrant বলে।

নূতন পরিবেশে মানুষের জীবনে সার্বিক দিক অর্থাৎ মৌলিক ও গৌণ প্রয়োজনের ইতিবাচক পরিবর্তন হয়। যেমন–

- উন্নত জীবনযাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।
- ব্যক্তি জীবনের পাশাপাশি পরিবারের বহুমুখী কল্যাণ সাধন হয়।
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়।
- শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসার ঘটে।
- সংস্কৃতির বিকাশ হয়।
- নারী শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের প্রসার ঘটে।
- ব্যক্তি আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।
- শিল্পের বিকাশ সাধন হয়।
- মানব কল্যাণমূলক কর্মসূচির সুযোগ সৃষ্টি হয়।

উল্লেখ্য যে অভিপ্রয়াণের প্রভাবে কিছু নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, যথা–

- অভিপ্রয়াণের পরিমাণ বৃদ্ধি হলে দেশ মেধাশূণ্য হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
- অপসংস্কৃতির সুযোগ থাকে।
- কখনও ব্যক্তি স্বার্থপরায়ণ হযে যায়।
- পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হওয়ার সুযোগ থাকে।

নগরায়ন (Urbanization)

নগর

নগর (Urban) হলো বহুসংখ্যক লোক ও বিভিন্ন জাতির বসবাস এবং শিল্প-বাণিজ্য ও প্রশাসনিক স্থান। অন্যদিকে বলা যায় গ্রামীণ শব্দের বিপরীত শব্দ। প্রকৃত অর্থে নগর একটি জনপদ। এ জনপদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জনগোষ্ঠীর রয়েছে পেশাগত বিচিত্রতা। নগরের অধিবাসী গ্রামের অধিবাসী অপেক্ষা সামাজিক, সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও ভিন্ন। মূলতঃ নগর হচ্ছে প্রশাসন, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, সভা-সমিতি ও উৎপাদনের প্রাণকেন্দ্র। এছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, স্থাপত্য, ক্রীড়া, বিনোদন প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবেচর্চার উপযোগী স্থান। ফলে স্বাভাবিকভাবে নগরে ঘন জনবসতি হড়ে ওঠে। অর্থাৎ নগর হচ্ছে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল, এবং অধিবাসীরা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। নেইল এন্ডারসনের ভাষায়, "নগর একটি নিবিড় বসতি"। যেমন– নিউ ইয়র্ক, লন্ডন, টোকিও এবং ঢাকা। নগরের সীমানা প্রশাসনিকভাবে নির্ধারণ করা হয়। প্রয়োজনের ভিত্তিতে নগরের সীমানা পরিবর্তন করা হয়। যেমন ঢাকা মহানগরের সীমানা একাধিকবার পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নগরকে সংজ্ঞায়িত করা হলো–

ভূগোলবিদ জেমস্ এইচ জনসন বলেন, "নগর এমন একটি জনপদ যেখানে বাসিন্দাদেরশতকরা পঞ্চাশ ভাগের অধিক কৃষি ব্যতীত অন্য পেশা অবলম্বন করে জীবিকা অর্জন করে"।

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার এর মতে, "একটি নগর পরিবেশন করে– একটি বাজার কর্মকান্ড এবং কমপক্ষে আংশিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে। একটি নগর অর্থনৈতিক, আইনগত ও নিরাপদমূলক কর্মকান্ড সম্পাদন করে"।

ম্যাক্স ওয়েবার

মার্কিন পরিসংখ্যান ব্যুরো মতে, একটি নগর হলো ঐ এলাকার আয়তন, ও লোক সংখ্যার ঘনত্বের পরিমাণ। অর্থাৎ জনসংখ্যার ঘনীভবনের মাত্রার উপরে ভিত্তি করে একটি এলাকাকে নগর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

The concentration of people in cities and towns.

প্রকৃত অর্থে নগর দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত, যথা–

১. একটি নির্দিষ্ট সীমানা চিহ্নিত ভূখন্ড
২. ভূখন্ডে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী।

জীবনকে সহজ, সুন্দর ও উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য নগরের গুরুত্ব অসীম।

নগরায়ন

নগর হতে নগরায়ন বা শহরায়ন (Urbanization) শব্দের উৎপত্তি। নগরায়ন একটি প্রক্রিয়া বিশেষ। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি হতে ক্রমশঃ প্রশাসন, শিল্প ও বাণিজ্যিকভিত্তিকবা অকৃষি পরিবেশে জনপদ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে নগরায়ন বলা হয়।

- বিশিষ্ট মার্কিন নগর ভূগোলবিদ মরিস ইয়েটস্ ও বেরি গার্ডনার বলেন, "নগরায়ন হলো সামাজিক ওঅর্থনৈতিক পরিবর্তনের এমন একটি জটিল প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি জনপদ গ্রামীণ অবস্থা থেকে ক্রমশঃ একটি প্রভাবশালী ও প্রাধান্য বিস্তারকারী নগর জনপদে পরিবর্তিত হয়।"
- সমাজ বিজ্ঞানী উগবার্ন বলেন, "নগরায়ন হলো গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্থানান্তরের মাধ্যমে নাগরিক সুযোগ সুবিধার প্রতিফলন"।
- Economic Commission for Asia and Far East (ECAFE)-এর মতানুসারে, "খুব সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে নগরায়ন বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বুঝায় যেখানে জনগণ স্বাভাবিকের চেয়ে বড় আকারে স্তূপীকৃত অবস্থায় বাস করতে সচেষ্ট হয়"।
- জাতিসংঘের অভিমত, "নগরায়ন বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বুঝায় যার মাধ্যমে দেশের জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান অংশ নগরাঞ্চলে বাস করে"।
- Encyclopedia Britannica, "Urbanization, the process by which large numbers of people become permanently concentrated in relatively small areas, forming cities."

অর্থাৎ, নগরায়ন হলো একটি প্রক্রিয়া যার ফলে উক্ত স্থানের জনগণ নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত উপায়ে কেন্দ্রিভূত হয়। সে সাথে মানুষের চিন্তা, ব্যবহার ও মূল্যবোধের পরিবর্তন সাধিত হয় এবং কৃষির পরিবর্তে অকৃষিভিত্তিক পেশা গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

কোন জনপদে শতকরা কতভাগ মানুষ গ্রাম ছেড়ে নগরে এসে বসবাস করে তার পরিমাপ কে নগরায়নের হার (Rate) বলে। নগরায়নের হার শতকরা হিসেবে এবং সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়

$$\text{নগরায়নের হার} = \frac{\text{নগর জনসংখ্যা}}{\text{মোট জনসংখ্যা}} \text{X ১০০}$$

নগরায়নের নিয়ামক

নগরায়নের নিয়ামক হিসেবে ২টি বিবেচ্য বিষয় রয়েছে, যথা–

ক. আকর্ষণ নিয়ামক (Pull Factor)
খ. বিকর্ষণ নিয়ামক (Push Factor)

ক. আকর্ষণ নিয়ামক– যে নিয়ামক জনগণকে নগরে আসতে আকৃষ্ট করে তাকে আকর্ষণ নিয়ামক বলে। নগরের যাবতীয় সুযোগ সুবিধআকৃষ্ট করে বিধায় মানুষ গ্রাম ছেড়ে নগরের বাসিন্দা হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মিথ বলেছেন, "নগর যত বড় হবে দক্ষতা ও বিশেষায়ন তত বেশি হবে"।

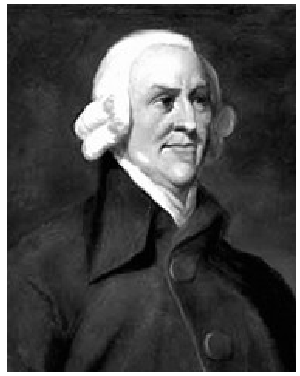

এ্যাডাম স্মিথ

খ) বিকর্ষণ নিয়ামক– মানুষকে গ্রাম থেকে বিতাড়িত করে বা ঠেলে দিয়ে যে নিযামক নগরে বসবাসের জন্য বাধ্য করে তাকে বিকর্ষণ নিয়ামক বলে। এক্ষেত্রে জমি ও শ্রম দুটি উপাদান বেশি কাজ করে।

উপরোক্ত নিয়ামক ছাড়াও নগরায়নের আরও নিয়ামক রয়েছে যা নিচে উল্লেখ করা হলো–

- নাগরিক নিরাপত্তা
- শিক্ষার সুযোগ
- গ্রামীন জীবনের প্রতি অনীহা
- চিকিৎসার সুবিধা
- দরিদ্রতা
- জীবন যাত্রার মান
- প্রযুক্তির প্রভাব
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন
- রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ
- নাগরিক নিরাপত্তা ও সুবিধা
- মানুষের অভিরুচি।

বাংলাদেশের নগরায়ন

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৭৪ সালের আগে জনসংখ্যার সুনির্দিষ্ট কাঠামো অনুসারে এ দেশে কোন নগর ছিল না। ১৯৭৪ ও ১৯৮১ সালে যথাক্রমে ঢাকাও চট্টগ্রামকে নগর হিসেবে বিবেচনায় আনা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে খুলনা নগরে পরিণত হয়। এরপর বাংলাদেশে নগরায়ন বৃদ্ধি পায়। তবে এ দেশে নগরায়নের বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার। তার কারণ হিসেবে দেখা যায় জনসংখ্যার তুলনায় মৃত্যুহার কম, শিক্ষার উন্নয়ন, বেকারত্ব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রযুক্তির উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, শিল্পোন্নয়ন, প্রভৃতি। এদেশে জনসংখ্যার পরিমাণ বিভিন্ন কারণে বৃদ্ধি হচ্ছে। ফলে নগরবাসীর সংখ্যাও ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশে নগরায়নের বিশেষত্ব হচ্ছে নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা কেন্দ্রমুখী ও ভারসম্যহীন। নগরায়নের ফলে শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যবসা বাণিজ্য, চিত্ত বিনোদন, জীবনমাত্রার মান প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও প্রসার ঘটেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৫

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. জনবিজ্ঞান অনুশীলন কেন প্রয়োজন?
ক. জনসংখ্যার পরিমাণ জানা
খ. জনসংখ্যাকে কাজে নিয়োজিত করা
গ. জনগণকে বিদেশে প্রেরণ করার পদ্ধতি জানা
ঘ. জনগণের সুযোগ সুবিধা জানা

২. কোনটি অভিপ্রয়াণের কারণ নয়?
ক. পেশাগত চাহিদা
খ. শিক্ষার উন্নয়ন
গ. উচ্চাকাঙ্খা
ঘ. দেশভ্রমণ

৩. মানুষকে গ্রাম থেকে বিতাড়িত করা কোন বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত?
ক. নগরায়নের বিকর্ষণ নিয়ামক
খ. নগরায়নের আকর্ষণ নিয়ামক
গ. মৌসুমি অভিপ্রয়াণ
ঘ. বহিঃস্থ অভিপ্রয়াণ

উত্তরমালা: ১. খ, ২. ঘ, ৩. ক

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. জনসংখ্যা বৃদ্ধি কখন ক্ষতিকর নয়?
২. মৌসুমি অভিপ্রয়াণ বলতে কী বোঝায়?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. অভিপ্রয়াণের কারণগুলো ব্যাখ্যা করুন।
২. নগরায়নের নিয়ামকগুলোর বিবরণ দিন।

পাঠ- ৫.৬: গ্রাম এবং শহরাঞ্চলের শিখনের চাহিদা ও অবস্থাসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- গ্রাম ও নগরের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবেন।
- গ্রাম ও নগরের শিক্ষার্থীর শিখনের চাহিদাগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- গ্রাম ও নগরে শিখনের অবস্থাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

গ্রামীণ ও নগরের জীবন ধারা

মানুষ এ বিশ্বে দুই ধরনের বসতি স্থাপনের মাধ্যমে জীবনযাপন করে। গ্রাম ও শহর তথা নগরে কতিপয় উপাদানের উপর নির্ভর করে এ বসতিদ্বয় স্থাপন করা হয়। মানুষের কর্মকান্ডের উপর নির্ভর করে উক্ত বসতি। কোন দেশে গ্রামের প্রধান্য দেখা যায়, আবার কোন দেশ শহরভিত্তিক। আবার কোথাও দেখা যায় শহরের আধিক্য বেশি হলেও শহরের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য দৃশ্যমান নয়। সাধারণত গ্রামীণ জীবনে ভিত্তি গড়ে ওঠে প্রাথমিক উপজীবিকার উপর ভিত্তি করে।অর্থাৎ কৃষিকাজ, পশুপালন, মৎস্য চাষ, মৎস্য শিকার ও বনজ সম্পদ আহরণ প্রভৃতি গ্রামীণ জনগণের উপজীব্য বিষয়। আর এদের বাসস্থানও হয় অনুন্নত। প্রকৃতপক্ষে এদের জীবনবোধ নিম্নমানের। অন্যদিকে শহর-নগরে থাকে বিশাল জনসংখ্যা এবং উপজীবিকা অকৃষিভিত্তিক।অর্থাৎ জনগণ চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানায় নিয়োজিত। এখানে মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণকরার সুযোগ থাকে। ফলে জীবনমান তুলনামূলকভাবে অনেক উন্নত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ দেখা যায়। সুন্দর পরিবেশ, উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা, স্থাপত্য, উন্নত নির্মাণ শৈলী, শিক্ষার সুব্যবস্থা, আধুনিক চিকিৎসা ও বিভিন্ন পেশা মানুষকে নগরমুখী করে তোলে।

শিখনের চাহিদা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা

মানুষের মৌলিক চাহিদগুিলোর মধ্যে শিক্ষার চাহিদা অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বেরসকল গ্রামীণ জীবনেই কম–বেশি রয়েছে তাদের পেশার উপর নির্ভরশীল। এছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রের ব্যবস্থপনাও তুলনামূলকভাবে আধুনিক নয়। অন্যদিকে সকল স্তরে শিক্ষা গ্রহণ করার মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও কম। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ গ্রামে নেই বললেই চলে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় জনপদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব অনেক বেশি। গ্রামের জনগণের কাছে মূলধনও কম থাকে। বেশিরভাগ পূর্ব পুরুষগণ শিক্ষা গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন। ফলে গৃহ পরিবেশ শিক্ষা অর্জনের প্রতি কিছুটা অনীহা গড়ে ওঠে। গ্রামের জনগণের চাহিদা তাই সীমিত। তারা অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে চাহিদার গতি নির্ধারণ করেন।

সাধরণত: গ্রামীণ জীবনে শিখনের ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা কম থাকে, যেমন–

- প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধা কম
- দক্ষ শিক্ষকের স্বল্পতা
- শিক্ষকের পেশাগত শিক্ষার অভাব
- আদর্শ শ্রেণিকক্ষের অভাব
- সুষ্ঠু শ্রেণি ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা
- আধুনিক সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত

- শিক্ষা উপকরণের অব্যবহার
- নারী শিক্ষার অভাব
- অনুন্নত জীবনমান

শহর তথা নগরের জীবনধারা গ্রামীণ জীবনের বিপরীত। আধুনিক জীবনের সাথে সঙ্গতি রেখে নগরের জনগণের চাহিদারও নিয়ত পরিবর্তন হয়। নগরের মানুষের কাজের বিভিন্নতা থাকায় জীবনযাপন প্রণালীও স্তরভিত্তিক। তবে নগরের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষার চাহিদা লক্ষ্য করা যায়। কর্ম চাঞ্চল্য জীবন যাপনের সাথে সাথে চাহিদারও প্রসার ঘটে। তাই শিক্ষার নানাবিধ অঙ্গনে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার জন্য এক নগর থেকে অন্য নগরে সঞ্চালন করে। নগরে যেহেতু বিভিন্ন শিক্ষার সুযোগ সুবিধা থাকে তাই শিক্ষার্থীর চাহিদার মধ্যেও থাকে বিচিত্রতা। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার সাথে সাথে শিক্ষা ক্ষেত্রের পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উন্নত জীবনযাপনের সহায়ক হয় যুগোপযোগী শিক্ষা অর্জন। তাই নগরের শিক্ষার্থীরা যুগোপযোগী শিক্ষা অর্জনে আগ্রহ প্রকাশ করে। নগরে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বর্তমান থাকায় স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার্থীদের চাহিদা থাকে উন্নত জীবনের প্রতি। আর তা মেটানোর অনেকাংশ পায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। শিক্ষার্থীরা তাদের উন্নত শিক্ষার চাহিদা মেটাতে এক নগর থেকে অন্য নগর, এক দেশ থেকে অন্য দেশে যায়। এভাবে তারা বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করে নিজে, পরিবার তথা দেশকে উন্নত করার সুপ্ত ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে পারে। নগরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে, যেমন–

- উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থাপনা
- সুদক্ষ শিক্ষক
- শিক্ষকের পেশাগত জবাবদিহিতা
- শিক্ষণে শিক্ষকের ইতিবাচক মানসিকতা
- উপকরণের সুষ্ঠু ব্যবহার
- উন্নত পাঠদান পদ্ধতির প্রয়োগ
- শ্রেণি পরিচালনার দক্ষতা
- শিক্ষার্থী মূল্যায়নের দক্ষতা
- প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদির উন্নত ব্যবস্থা
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নত ব্যবস্থা
- শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুকূল সম্পর্ক
- সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন
- সুষ্ঠু প্রশাসন ব্যবস্থা
- নারী শিক্ষার প্রসার
- সামাজিক সচেতনতা।

বাংলাদেশের গ্রামীণ ও নগরের শিক্ষা

বিশ্বের অন্যান্য গ্রাম ও নগরের শিক্ষাক্ষেত্রের মত বাংলাদেশের পার্থক্য রয়েছে। তবে উন্নত দেশ অপেক্ষা এদেশে পার্থক্য প্রকট। গ্রামীণ জীবন অনুন্নত হওয়ায় তুলনামূলকভাবে শিক্ষার হার কম। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও গ্রামে কমথাকে এবং উচ্চ শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। প্রতিষ্ঠানগত সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে নগরের প্রতিষ্ঠানগুলো এগিয়ে আছে। ফলে প্রশাসনিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নগরে সরকারি স্কুলে পাশাপাশি ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনায় বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা অর্জনের

সুযোগ পায়। নগরে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে রয়েছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, গণশিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের প্রচুরতা। এছাড়া নগরে বিভিন্ন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা রয়েছে। নারী শিক্ষার প্রসার ও সেখানে দেখা যায়। এছাড়া নগরে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা রয়েছে বিধায় ক্ষেত্র বিশেষে নিজেকে উন্নত করার চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়।

❖ **বাংলাদেশে নগর ও গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থার পার্থক্য**

গ্রামীণ	**নগর শিক্ষা**
বিদ্যালয়ে ভৌত সুযোগ-সুবিধা কম থাকে।	বিদ্যালয়ে ভৌত সুযোগ-সুবিধা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে।
গ্রামীণে শিক্ষার হার নগরের তুলনায় কম থাকে।	শিক্ষার হার বৃদ্ধি পায়।
উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান কম থাকায় এ শিক্ষা তুলনামূলকভাবে কম সুযোগ পেয়ে থাকে।	উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেশী থাকায় উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত সংখ্যা গ্রামীণ তুলনায় বেশি।
গ্রামীণ এ যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকের অভাব।	যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক অভাব হয় না।
শিক্ষার গুণগতমান হ্রাস পায়।	শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি পায়।
শিক্ষার্থী ঝড়ে পড়া সংখ্যা বেশি।	শিক্ষার্থী ঝড়ে পড়া সংখ্যা নাই বললেই চলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৬

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. গ্রামীণ জীবন কীসের উপর নির্ভরশীল?
ক. সমাজের উপর
খ. মানুষের স্বভাবের উপর
গ. উপজীবিকার উপর
ঘ. ধর্মের আধিক্যের উপর

২. শিক্ষা অর্জনের সর্বাপেক্ষা উপযোগী পরিবেশ কোনটি?
ক. গ্রামীণ পরিবেশ
খ. সামাজিক পরিবেশ
গ. নগর পরিবেশ
ঘ. গৃহ পরিবেশ

উত্তরমালা: ১. গ, ২. ঘ।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. গ্রাম ও নগরের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন।
২. গ্রামের শিক্ষার্থীদের চাহিদা উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. গ্রামে শিক্ষার সুযোগ সুবিধা কম-মতামত প্রদান করুন।
২. বাংলাদেশের গ্রামীণ ও নগরের শিক্ষার পার্থক্য করুন।

পাঠ- ৫.৭: মান নির্দেশক: পরিবেশ, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও জীবন যাত্রার মান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পরিবেশের উপর শিক্ষার নির্ভরশীলতা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- স্বাস্থ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা প্রদান করতে পারবেন।
- মানব জীবনে খাদ্যের ভূমিকা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মান সম্মত জীবন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

শিক্ষা একটি গতিশীল প্রক্রিয়া তাই তার প্রভাব পড়ে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে। অন্যভাবে বলা যায়, চলমান সমাজের সাথে সাথে শিক্ষার গতিপ্রাপ্ত হয় সমাজের চাহিদার প্রতিফলন ঘটে শিক্ষা ব্যবস্থায়। আজ বিশ্বায়নের প্রভাবে বিভিন্ন পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষার পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটেছে। সামাজিক-সংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও হয়েছে ধনাত্মক পরিবর্তন। বর্তমানে উন্নয়ন ও ধনাত্মক পরিবর্তনকে একে অপরের সমার্থক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আর এর মান নির্দেশক হিসেবে ভূমিকা রাখেপরিবেশ, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও জীবনযাত্রার মান।

পরিবেশ

মানুষ যে অবস্থার মধ্যে জীবন করে তাকে পরিবেশ বলা হয়। অর্থাৎ আমাদের চারদিকে যা কিছু আছে সবই পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃত অর্থে এ পৃথিবীর জীব, অজীব সবই পরিবেশের উপাদান। উইকিপিডিয়া অনুসারে, পরিবেশ বলতে কোন ব্যবস্থার বাহ্যিক প্রভাবকসমূহের সমষ্টিকে বোঝায়।যেমন চারপাশের ভৌত অবস্থা, জলবায়ু ও প্রভাব বিস্তারকারী অন্যান্য জীব ও জৈব উপাদান। পরিবেশের সাথে সমগ্র প্রাণিজগতের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

পরিবেশের প্রকারভেদ

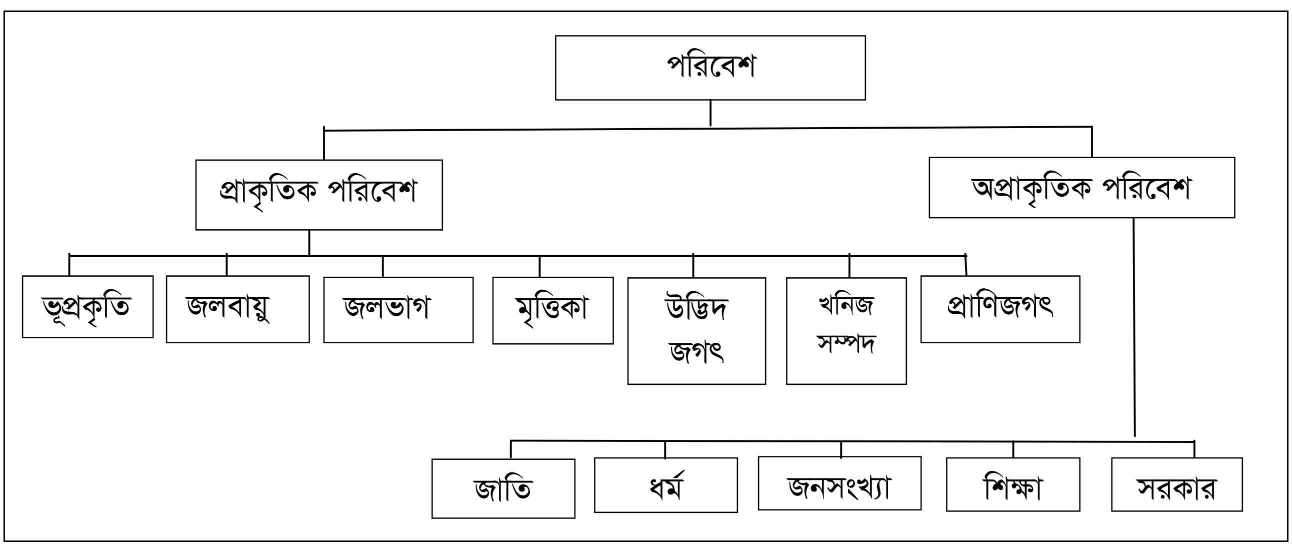

এ প্রকারভেদ থেকে স্পষ্ট যে, আমাদের চারপাশে পরিবেশের সব উপাদানই বর্তমান। মূলতঃ পরিবেশের প্রতিটি উপাদানের দ্বারা মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রভাবিত হয়। অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ ধারণা করে আসছে যে, মানুষের সকল কাজ প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ভূগোল বিষয়ে এ চিন্তাধারা পরিবেশবাদ নামে সুপরিচিত। পরিবেশবাদ বা Environmentalism সম্বন্ধে প্রথম উপস্থাপন করেন হিপক্রেটিস (৪২০ খ্রিস্টপূর্ব)। তিনি প্রমাণস্বরূপউদাহরণ দেন ইউরোপের জলবায়ু বৈচিত্রপূর্ণ বিধায় সেখানকার মানুষের শারীরিক গঠনেও বৈচিত্র রয়েছে।শুধুমাত্র পরিবেশ নিয়ে আলোচনা করা হয় জীব বিজ্ঞানের অন্তর্গত যে শাখাতা পরিবেশ বিদ্যা বা Ecology নামে অভিহিত। Phillipson (১৯৭০) বলেন,"জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জীব জগতের সাথে ভৌত ও জৈব পরিবেশের প্রভাবজনিত সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয় তাকে বাস্তুবিদ্যা বা Ecology বলে। তবে আজ মানুষের কর্মকান্ড বিশ্লেষণ করলে প্রমাণ পাওয়াযায় যে, মানব সংস্কৃতি তাদের কর্মকান্ডের প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি এবং গৌণ ভূমিকা পালন করে প্রাকৃতিক পরিবেশ। অর্থাৎ প্রকৃতভাবে পরিবেশের প্রভাব বা ভূমিকা নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষের সংস্কৃতি দ্বারা। মানুষ তার সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিহার বিশ্লেষণ করে নিজেদের মতানুসারে ব্যবহার করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সমগ্র বিশ্বে সামাজিক পরিবর্তনের (অপ্রাকৃতিক পরিবেশ বা সাংস্কৃতিক পরিবেশ) অন্যতম কারণ হলো জলবায়ু পরিবর্তন (প্রাকৃতিক পরিবেশ)। আর জলবায়ু পরিবর্তনের ফলাফল স্বরূপ অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, খাদ্য, কৃষি, জলভাগ, প্রাণিজগৎ, বনজসম্পদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তবে সুখের বিষয় সব ধরনের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য মানুষ আজ বৃহত্তর পরিবেশ থেকে উন্নত ও উপযোগী শিক্ষা অর্জন করছে, আর সে সাথে সমাধান বা টিকে থাকার জন্য অর্জনকৃত জ্ঞান প্রয়োগ করছে। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি সাধন হচ্ছে। মানুষ নানা দিকে যত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সমাধানের জন্য তত বেশি শিক্ষার আশ্রয় নিচ্ছে। প্রয়োজন থেকে বিস্তার লাভ করছে নানামুখী শিক্ষা; এভাবেই হচ্ছে শিক্ষার উন্নয়ন।

স্বাস্থ্য

আমাদের জীবন সুন্দর ও আনন্দদায়ক করার জন্য প্রয়োজন সুস্বাস্থ্য। সাধারণত অর্থে দৈহিক সুস্থতাকে স্বাস্থ্য বলা হয়। তবে ব্যবপক অর্থে শারীরিক ও মানসিক ও সুস্থ পরিবেশকে স্বাস্থ্য বলে। হফকিনস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অনুষদের মতানুসারে, স্বাস্থ্য হল মানুষের শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতা। World Health Organization বা WHO-এর মতে, Health is the state of complete physical, mental and social well-being, not merely the absences of diseases or infirmity. অর্থাৎ স্বাস্থ্য হল মানুষের পরিপূর্ণ শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতা, যেখানে কোন রোগ বা দুর্বলতা নেই। স্বাস্থ্যহীন জীবন উন্নত জীবনের পরিপন্থি। আর সুস্বাস্থ্যময় জীবন উপভোগ করার মূলে রয়েছে দুটি বিশেষ উপাদান– উপযোগী পরিবেশ তথা দূষণমুক্ত পরিবেশ ও পুষ্টিকর খাদ্য। সুতরাং সহজেই বলা যেতে পারে স্বাস্থ্যের সাথে নির্মল পরিবেশ ও পুষ্টিকর খাবার ওৎপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। মানুষের জীবন সুন্দর ও উন্নত করতে একান্তভাবে প্রয়োজন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নূন্যতম জ্ঞান। এ দিক থেকে গ্রাম অপেক্ষা নগরবাসী বেশ সচেতন।

সমগ্র বিশ্বে দেখা যায় অপেক্ষা গ্রামের মানুষ ভগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী। তাদের জীবন মান অনুন্নত হওয়ায়দূষণমুক্ত পরিবেশ ও সুষম খাদ্য সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হয়। সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১০টি সূচক বা মানদন্ড প্রদান করেছে–

১. কর্মশক্তি সম্পন্ন স্বাভাবিক জীবনের বিভিন্ন কাজ মোকাবেলা করতে সক্ষম।
২. আশাবাদী-সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ করতে পারে।
৩. নিয়মিত বিশ্রাম নেয় ও ঘুম ভাল হয়।
৪. পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে সক্ষম।
৫. সাধারণ সর্দি ও সংক্রামক রোগ প্রতিরোধক শক্তি আছে।

৬. ওজন সঠিক, শরীরের সংগঠনিক দিক সঠিক।
৭. চোখ উজ্জ্বল, কোন প্রদাহ রোগ নেই।
৮. দাঁত পরিষ্কার এবং সতেজ, ব্যথা নেই।
৯. চুলে খুশকি নেই, উজ্জ্বলতা আছে।
১০. হাড় স্বাস্থ্যবান, পেশি ও ত্বক নমনীয়, হাঁটতে কোন অসুবিধা নেই।

যথাযথভাবে স্বাস্থ্য গড়ে তুলতে প্রয়োজন স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন। শরীর সম্বন্ধীয় জ্ঞান অর্জন করাকে স্বাস্থ্য শিক্ষা বা Health Education বলা হয়। শিক্ষাবিদগণের মতানুসারে, Health Edducation includes many thing. It includes physical health, mental health and social health. তবে বর্তমানে সুস্বাস্থ্যের জন্য বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতির মাধ্যমে শরীর সম্বন্ধীয় শিক্ষা অর্জন করা হয়। আজ বিশ্বের সর্বত্র স্বাস্থ্যশিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নয়ন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

স্বাস্থ্যশিক্ষার লক্ষ্য

চিকিৎসাবিদগণের মতে স্বাস্থ্য শিক্ষার লক্ষ্য নিম্নরূপ−

- শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক দিক সুস্থতা রক্ষা;
- পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা;
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অনুশীলন ও দূষণ নিবারণ।

স্বাস্থ্যশিক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ব্যক্তির সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং ভবিষ্যৎ জীবনে সুস্থ থাকার মানসে স্বাস্থ্য বিধি বা Hygiene চর্চা করার মানসিকতা জন্মে। স্বাস্থ্যবিধি সুস্থ জীবন ধারণের জন্য রোগ জীবাণু হতে প্রতিকারমূলক বিধি বিধানকে বুঝায়।

UNICEF-এর ভাষায় স্বাস্থ্যবিধি হচ্ছে, অসুস্থতা বা রোগের বিস্তার প্রতিরোধ কল্পে ব্যক্তি ও তার চারপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশনাবলি। স্বাস্থ্যবিধিতে মানুষের ব্যক্তি পর্যায় থেকে তার বিচরণের সমগ্র ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ জনজীবন থেকে জনস্বাস্থ্য পর্যন্ত এর আওতাভুক্ত। স্বাস্থ্যবিধির মাধ্যমে মানুষ আজ সুস্থ, সফল ও সার্থক জীবন গড়ে তুলতে প্রয়াসী যা প্রকৃত শিক্ষা ও উন্নয়নকে সুস্পষ্ট করে।

ইউনিসেফ-প্রধান সদর দপ্তর

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বাংলাদেশে আজ স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অগ্রসরমান। সুস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছে বিভিন্ন কর্মসূচি। হাসপাতালের সেবার মান উন্নয়ন, রোগী ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, মেডিকেল কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রতিটি জেলা ও

উপজেলাতে সরকারি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন, মোবাইল স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র ও বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান অন্যতম। এছাড়া উন্নত স্বাস্থ্য সেবার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় চারটি অধিদপ্তরের মাধ্যমে সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে যেমন–

ক. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর;
খ. পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর;
গ. নার্সিং সেবা অধিদপ্তর;
ঘ. ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর।

এছাড়া Millennium Development Goals বা MDG সূচক অনুসারে শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, শিশু ও মায়েদের টিকা প্রদান, ভিটামিন 'এ' এর ঘাটতি দূরীকরণে সেবা দান প্রভৃতি কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। জনগণের স্বাস্থ্য সেবা সুনিশ্চিত করতে গৃহীত হয়েছে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির রয়েছে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, যেমন–

১. সবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।
২. সমতার ভিত্তিতে সেবা গ্রহীতাকেন্দ্রিক মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবার সহজপ্রাপ্যতা বৃদ্ধি ও বিস্তৃত করা।
৩. রোগ প্রতিরোধ ও সীমিতকরণের জন্য অধিকার ও মর্যাদার ভিত্তিতে সেবা গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

উল্লেখ্য যে, সরকারি ব্যবস্থার পাশাপাশি বেসরকারি খাত, এনজিও এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এদেশের স্বাস্থ্যসেবার জন্য কাজ করছে।

খাদ্য

খাদ্য মানুষ তথা সার্বিক জীব জগতের জন্য অপরিহার্য উপাদান। খাদ্য ব্যতিরেকে কোন জীব (প্রাণী ও উদ্ভিদ) বাঁচতে পারে না। খাদ্যের উপরই সকল জীবের জীবন নির্ভরশীল। তাই জীবদেহে সকল শক্তির উৎস হলো খাদ্য। তবে সকল জীবের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য। তাহলে খাদ্য কী? যে সব উপাদান জীব জগতেরশরীরগত গঠন, ক্ষয়পূরণ, তাপ ও শক্তি উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে খাদ্য বলে। খাদ্য মূলতঃ শরীরের ভিতরের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে, শরীরকে সুস্থ রাখে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং কর্মক্ষমতা সৃষ্টি করে। সুতরাং সব খাবার খাদ্য হিসেবে পরিগৃহীত নয়।

খাদ্যের সাথে পুষ্টি সংশ্লিষ্ট। খাদ্য গ্রহণের ফলে জীবের শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ জীব খাদ্য গ্রহণ কওে পরিপাক, খাদ্য সার শোষণ, শরীরের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি সাধন ও শক্তি যেগায় এবং খাদ্যের যে অংশ হজম হয় না তা শরীর থেকে নিষ্কাশিত করে তাকে পুষ্টিবা Nutrition বলা হয়। স্বাভাবিকভাবে মানুষ পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে চায়। তাই পুষ্টি সম্বন্ধীয় জ্ঞান সকল মানুষের থাকা আবশ্যক। উন্নত বিশ্বের মানুষ এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। তাই তাদের দৈহিক গঠন যথেষ্ট মজবুত এবং কর্মক্ষমতা ও গড় আয়ু বেশি।

পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা

- শরীর গঠন, বুদ্ধিমত্তা, শরীর বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ হয়;
- রোগ প্রতিরোধ করে;
- শরীরের শক্তি ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

দৈনন্দিন জীবনে সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সুষম খাদ্য (Balance Diet) বলতে যে খাদ্য দেহের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটায়, ক্ষয় পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন করে এবং যথাযথভাবে শারীরবৃত্তীয় কাজগুলোর নিয়ন্ত্রণ করেতাকে বোঝায়।আবার যে খাদ্যে শর্করা, আমিষ, চর্বি, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, ও পানি খাদ্যের এ উপাদানগুলো পরিমাণমত ও যথাযথ মাত্রায় থাকে তাকে সুষম খাদ্য বলে। যেমন– দুধ, ডিম ইত্যাদি। সুষ্ঠু জীবনের জন্য প্রয়োজন সুষম খাদ্য তালিকা অনুসরণ করা। মানুষের অবস্থান, বয়স, নারী-পুরুষের পার্থক্য, দৈহিক অবস্থা, শ্রমের পার্থক্য প্রভৃতির উপর নির্ভর করে সুষমখাদ্য তালিকা প্রণয়ন করা হয়।

সুষম খাদ্য

অন্যদিকে খাদ্যাভ্যাস বা Food Habit মানুষের জীবনযাপনের জন্য অতি গুরুত্ব বহন করে। এক্ষেত্রে গ্রাম ও নগর জীবনের পার্থক্য দেখা যায়। খাদ্যের উপাদান ও তার কার্যকারিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন। শিশু, যুবা, বয়স্ক সকল শ্রেণির মানুষের সুষ্ঠু খাদ্যাভ্যাস না থাকলে শারীরিক অসামঞ্জস্যতা ও রোগের প্রকোপ দেখা দেয়।

খাদ্যের প্রকারভেদ

জীবদেহে খাদ্যের কার্যকারিতা অনুসারে খাদ্য দু'ভাগে বিভক্ত। যথা–

ক. দেহপরিপোষক খাদ্য;
খ. দেহসংরক্ষক খাদ্য।

ক. দেহপরিপোষক খাদ্য– দেহের গঠন, বৃদ্ধি, তাপ ও শক্তি উৎপাদনে সহায়ক যে খাদ্য তাকে দেহপরিপোষক খাদ্য বলে, যেমন– শর্করা (Carbohydrate), আমিষ (Protein), এবং স্নেহজাতীয় পদার্থ (Fat)।

খ. দেহসংরক্ষক খাদ্য– যে খাদ্য দেহের রোগ সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং শক্তি উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, সে জাতীয় খাদ্যকে দেহসংরক্ষক খাদ্য বলা হয়, যেমন– খাদ্যপ্রাণ (Vitamin), খনিজ পদার্থ (Minerals)।

খাদ্যের উপাদান

খাদ্যের মোট উপাদান ছয়টি। শর্করা, আমিষ, স্নেহ জাতীয় পদার্থ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি। উপাদানের কাজ হিসেবে খাদ্যের উপাদানকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা–

i. খাদ্যের মুখ্য উপাদান– শর্করা, আমিষ, স্নেহ জাতীয় পদার্থ।
ii, খাদ্যের গৌণ উপাদান– ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি।

উন্নত দেশগুলোতে খাদ্যের গুণগত মান ও পরিমাপ যতাযথভাবে জনগণ মেনে চলে। সুষম খাদ্যকে বিবেচনায় রেখে তারা খাদ্যাভাস গড়ে তোলে। তাই এর সুফলও তারা ভোগ করে। আর এসবই হয় তাদের উন্নত শিক্ষার প্রভাবে। তাদের শিক্ষা প্রভাবিত করে মূল খাদ্য, সুষম খাদ্য, খাদ্যাভ্যাস, মা ও শিশুর খাদ্য রোগীর পথ্য সর্বপরি খাদ্য ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি নির্বাচন করতে। আর এ ক্ষেত্রে গ্রাম ও নগরের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য দেখা যায় না। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশের বেশিরভাগ জনগণের খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কীয় জ্ঞান সীমিত কিংবা আমলে দেয় না। এছাড়া শিক্ষা বড় অন্তরায় হিসেবে ভূমিকা পালন করে। ফলে ক্যালরি, সুষম খাদ্য, কৃত্রিম খাবার ও খাদ্য সম্পর্কীয় বিভিন্ন ধারণা সম্পর্কে এ দেশের মানুষ বেশ অসচেতন। তবে সুখের বিষয় বাংলাদেশের শিক্ষার হার পূর্বের তুলনায় ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বাড়ছে সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ। সে জন্য শিক্ষার উন্নয়নের সাথে সাথে খাদ্য বিষয়েও উন্নত ধারণা লাভ করবে আশা করা যায়।

জীবনযাত্রার মান

আদিম যুগ থেকে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন শুরু হয়েছে। মানুষের চিরন্তন অভিলাষ নূতনত্বের প্রতি। সে কারণে মানুষ আজ আদিম যুগের জীবনযাত্রা পরিত্যাগ করে বিজ্ঞানের যুগে নিজেকে হোমোস্যাপিয়েন্স রূপে প্রতির্ষ্ঠিত করতে পেরেছে। আবিষ্কার করেছে জীবনযাত্রা সহজ ও আনন্দময় করার উপযোগী নানা উপাদান। যুগে যুগে কিছু মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন আশীর্বাদ হয়ে। তাই তাঁরা দিয়ে যেতে পেরেছেন নানা তথ্য, তত্ত্ব, উপাদান সামগ্রী।

জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির সূচক

জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায় বিভিন্ন নির্ণায়কের উপর ভিত্তি করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

- মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি;
- শিক্ষার হার বৃদ্ধি;
- গড় আয়ু বৃদ্ধি;
- জন্ম ও মৃত্যু হার হ্রাস;
- দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা;
- বেকার সমস্যার সমাধান;
- উৎপাদন বৃদ্ধি;
- জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা।

বর্তমানযুগ বিজ্ঞানের। বলা চলে বর্তমানে বিজ্ঞানই মূল চালিকা শক্তি। বিজ্ঞানের নিদর্শন আজ সর্বত্র বিরাজমান। তাই আজ জনগণের মান উন্নয়নে বিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। তবে শিক্ষা ব্যতীত জীবনমান উন্নত হতে পারে না। মূলতঃ বিজ্ঞান ও শিক্ষা একে অপরের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট। অপরদিকে শিক্ষার হাত ধরেই ঘটেছে বিজ্ঞানের উন্নয়ন। শিক্ষারও ক্রমপরিবর্তন ঘটেছে, সে সাথে আমাদের চাহিদারও পরিবর্তন হচ্ছে নিরন্তর। এ কারণেই শিক্ষা গতিশীল। চলমান শিক্ষা আজ গুরুগৃহ থেকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে উন্নত হয়েছে। তাই বলা যায় শিক্ষার উন্নয়ন অর্থ ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন।

বর্তমানে শিক্ষার উন্নয়নের ফলে বিশ্বের সব দেশেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক পরিবর্তন দৃশ্যমান। মানুষ আজ মার্তৃগর্ভ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত উন্নয়নের স্পর্শ অনুভব করছে। মানুষের জীবনে যা কিছু চাহিদা বা প্রয়োজন তার সবই পাচ্ছে অতীত থেকে উন্নত অবস্থায়। শিক্ষার উন্নয়নের কারণে মানুষের রুচিবোধ, জীবনবোধ ও চাহিদার পরিবর্তন হয়েছে। আর এ সব পরিবর্তনের কারণে মানুষ এখন অনেক বেশি মানসম্মত জীবনযাপন করছে। ঘরে বাইরে

সকল স্থানের মানুষ এ মান বজায় রাখতে দৃঢ়চিত্ত। তবে মানুষ বর্তমান মান বজায় রাখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। এ মানকে আরও উন্নীত করতে যেন বদ্ধ পরিকর।

বিশ্বায়নের যুগে প্রযুক্তির অবাধ প্রবাহ, তথ্য ও প্রযুক্তিগত প্রসার, অবাধ বাণিজ্য ও মুক্তবাজার অর্থনীতি, সামাজিক, সংস্কৃতির গতিশীলতা প্রভৃতি মানুষকে করেছে উদার, সংস্কারমুক্ত, যুক্তিবাদী ও বাস্তবপন্থী। ফলে উন্নত দেশে ইতিবাচক যা ঘটেছে তা উন্নয়নশীল দেশের মানুষ অনুসরণ করছে। আর এভাবে জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে। উন্নত বিশ্বের নগর ও গ্রামীণ জীবনের পার্থক্য প্রকট না হওয়ায় সব স্থানের জনগণের মান উন্নত পর্যায়ের। তবে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোতে গ্রাম ও নগর জীবন যে মান বহন করে চলেছে সে মানে পৌঁছাতে গ্রামের জনগণের যথেষ্ট সময় লাগছে। এভাবে শিক্ষা মানুষকে মান সম্মত জীবনের প্রতি আকর্ষণ করে চলেছে।

নগরের মানুষ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কাজের সম্মুখীন হয় যেমন, প্রশাসনিক, প্রতিরক্ষা, বাণিজ্যিক, সংস্কৃতিক, শিল্প–সংক্রান্ত প্রভৃতি। এ ক্ষেত্রগুলোর কাজের ধারা আজ আর পূর্বের মত নেই, তথ্য ও প্রযুক্তির প্রসারে আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে গ্রামের মানুষের কাজেও পরিবর্তন এসেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সব ধরনের কৃষিকাজে পদ্ধতি ও কৌশলগত পরিবর্তন হওয়ায় ফলন বৃদ্ধি হচ্ছে, কষ্ট লাঘভ হচ্ছে, অর্থনৈতিক দিক থেকেও হচ্ছে লাভবান। ফলে তাদের জীবনেও কিছুটা উন্নতির আভাষ পাওয়া যায়।

শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রকৌশল, আইন, বিনোদন প্রভৃতি ক্ষেত্রেও আজ উন্নত থেকে উন্নতর হচ্ছে। এ উন্নয়নের ছোঁয়া সংশ্লিষ্ট পেশাজীবির জীবনবোধ বদলে দিচ্ছে। অনুভব করছে উন্নয়নের জয়যাত্রা।

বাংলাদেশের জীবনযাত্রার মান

বাংলাদেশেও উন্নয়নের জোয়ার এসেছে। পূর্বের থেকে দেশের জনগণ এখন অনেরক বেশি সচ্ছল ও স্বাচ্ছন্দ অনুভব করেন, আর সে সাথে বেড়েছে জীবনযাত্রার মান। এখন ঘরে ঘরে মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগাচ্ছে, জীবনের সব ক্ষেত্র আজ তুলনামূলকভাবে আধুনিক হয়েছে।

বাংলাদেশ দশটি সামাজিক সূচকে বেশ অগ্রসর হয়েছে, যেমন–

১. গড় আয়ু;
২. শিক্ষার হার;
৩. মাতৃ মৃত্যুর হার;
৪. শিশুমৃত্যুর হার;
৫. পানির ব্যবহার;
৬. বিদ্যুত ব্যবহার;
৭. নির্ভরশীলতার অনুপাত;
৮. স্থুল প্রতিবন্ধকতা;
৯. জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার;
১০. টয়লেট সুবিধা।

বাংলাদেশের মধ্যম আয়ের দেশে প্রবেশ করলে মানুষ আরও উন্নত জীবনযাপন করবে। জাতিসংঘ বাংলাদেশের মধ্যম আয়ের দেশে প্রবেশের জন্য ৩টি মানব উন্নয়ন সূচক প্রদান করেছে, যেমন–

১. মাথাপিছু আয় সূচক– সর্বনিম্ন ১১৯০ ডলারে উন্নীত হতে হবে।
২. মানব সম্পদ উন্নয়ন সূচক– ৬৬ অপেক্ষা বেশি অর্জন করতে হবে।
৩. অর্থনৈতিক সংকট সূচক– ৩২ বা অপেক্ষাকৃত কম অবস্থানে থাকতে হবে। (জাতিসংঘ সূচক)

বাংলাদেশ জাতিসংঘের শর্ত মেনে চলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। চেষ্টা সফল হলে এদেশের জীবনযাত্রার মান নিঃসন্দেহে উন্নীত হবে। অন্যদিকে MDG বা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বেশ সফলতা লাভ করছে। উক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জন করার মাধ্যমেও বাংলাদেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ঘটবে নিশ্চিত বলা যায়।

মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ

১. চরম দারিদ্র ও ক্ষুধা নির্মূল;
২. সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন;
৩. লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ ও নারীর ক্ষমতায়নের উন্নয়ন সাধন;
৪. শিশুমৃত্যুও হার হ্রাস;
৫. মাতৃস্বাস্থ্য উন্নতি;
৬. এইডস ও ম্যালেরিয়ার মতো রোগ নির্মূল;
৭. টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ;
৮. বৈশ্বিক সম্পর্ক জোরদার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৭

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. মানুষের সকল কাজ প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত– এ বাক্যটি নিচের কোনটির সমার্থক?
ক. পরিবেশবাদ
খ. পরিবেশবিদ্যা
গ. প্রাকৃতিক পরিবেশ
ঘ. অপ্রাকৃতিক পরিবেশ

২. দেহ পরিপোষক খাদ্য কোনটি?
ক. আমিষ–ভিটামিন
খ. আমিষ–শর্করা
গ. শর্করা–খনিজ
ঘ. আমিষ–খনিজ

৩. কোনটি জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি নির্ণায়ক নয়?
ক. জন্ম ও মৃত্যু হার হ্রাস
খ. মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি
গ. উৎপাদন বৃদ্ধি
ঘ. খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ হ্রাস

উত্তরমালা: ১. ক, ২. খ, ৩. ঘ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. পরিবেশের প্রকারভেদ উল্লেখ করুন।
২. সুষম খাদ্য কাকে বলে?
৩. স্বাস্থ্যশিক্ষা পাঠের প্রয়োজনীয়তা কী?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোকপাত করুন।
২. জীবনমান বৃদ্ধির সূচকসমূহ বর্ণনা করুন।

পাঠ ৫.৮: সাংস্কৃতিক বিশ্বাস এবং দৃষ্টিভঙ্গি Cultural Beliefs and Attitudes

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সংস্কৃতিক বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সংস্কৃতিক বিশ্বাস এবং সমাজ গঠনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষা উন্নয়নে সংস্কৃতিক বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- শিক্ষা উন্নয়নে সংস্কৃতিক বিশ্বায়নের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

বিশ্বায়নের একটি অন্যতম অনুষঙ্গ হলো সাংস্কৃতিক বিকাশ। বিশ্ব ব্যবস্থায় সংস্কৃতির পরিধি ক্রমশ বাড়ছে। মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতি চেতনা বিস্তার ঘটেছে। এক দেশের সংস্কৃতি সহজে অন্য দেশে প্রবেশ করছে। সাংস্কৃতির বিশ্বাস ও বিশ্বব্যাপী প্রবাহে বিশ্বায়নে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটছে। সংস্কৃতি প্রসঙ্গে সমাজ বিজ্ঞানী Jones বলেন, “Culture is the sum of man's creations” অর্থাৎ মানব সৃষ্ট সব কিছুর সমষ্টিই হচ্ছে সংস্কৃতি। সংস্কৃতিক বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের ফলে শিক্ষার উন্নয়ন প্রসার ঘটছে। আর সাধারণত কোন সুনির্দিষ্ট বস্তু, ব্যক্তি ও ঘটনাকে নিয়ে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের যে ধারণা বা উপলব্ধি জন্মে তা হলো বিশ্বাস। সমাজবিজ্ঞানী থমসন এর মতে, “বিশ্বাস হল গতিশীল এবং প্রারম্ভিক সংবেদনশীল মানসিক কাঠামো যা অভিজ্ঞতার আলোকে পরিবর্তনশীল” এটি সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিশ্বাস থেকে দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হয় আবার দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও বিশ্বাস আসে। এই বিশ্বায়নের শিক্ষার উন্নয়নে সাংস্কৃতিক বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি অন্যতম শর্ত বলে বিবেচনা করা যায়।

সাংস্কৃতিক বিশ্বাস এবং দৃষ্টিভঙ্গির তাৎপর্য

“সংস্কৃতি” শব্দটি ইংরেজী প্রতিশব্দ হল এই Culture. ল্যাটিন শব্দ “Colere থেকে এই Culture শব্দটি এসেছে। Colere সংস্কৃতিক শব্দের অর্থ হলো কর্ষণ করা বা চাষ করা। অর্থাৎ সংস্কৃতি বলতে বুঝায় কর্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিষয়। মানব সংস্কৃতির অত্যন্ত শক্তিশালী উপাদান হল বিশ্বাস। বিশ্বাস কোন বিশেষ একটি বিষয় সম্পর্ক ব্যক্তির সত্যের স্থির প্রত্যয়ন। প্রত্যেক সমাজের মানুষের মধ্যে বিভিন্ন জিনিসের প্রতি বিভিন্ন রকমের বিশ্বাস দেখতে পাওয়া যায়। যেমন তথ্য প্রযুক্তির যুগে বিশ্বায়নের ভূমিকার প্রতি আস্থা। বিশ্বায়নের এক সমাজ অন্য সমাজের সংস্কৃতিকে লালন পালন করছে। এতে সংস্কৃতির পরিবর্তনের সাথে সমাজে প্রথা কৃষ্টি, আচরণের পরিবর্তন করতে হয় যা মানুষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে শিক্ষা উন্নয়নের প্রয়োজন। সকল বিশ্বাসই হলো সংস্কৃতির অঙ্গ। তাছাড়া এই পৃথিবীতে যাবতীয় বিশ্বাসের উপর এক অদৃষ্ঠ শক্তি সর্বদা যা বিশ্বাসের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

সংস্কৃতির উপাদান হিসেবে বিশ্বাসের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও কার্যকরী। এ বিশ্বাস দ্বিমতের অবকাশ নেই। সমাজে বসবাসরত অমূলক বিশ্বাস থেকেও দৃঢ়তার সাথে কাজ করতে দেখা যায়। ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের লক্ষ্যকে এবং সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উপায়কে বিশ্বাস প্রভাবিত করে থাকে। তাছাড়া সমাজে বসবাসরত ব্যক্তিবর্গের

পারস্পরিক সম্পর্ককে বিশ্বাস বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। আবার বিশ্বায়নেও একদেশের সমাজের বিশ্বাসকে অন্য দেশের সমাজকে প্রভাবিত করে থাকে। অর্থাৎ সামগ্রিক বিচারে মানুষের আচার আচরণ ও প্রবণতার উপর বিশ্বাসের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া অতিমাত্রায় সক্রিয়। সুতরাং সমাজে প্রচলিত বিশ্বাসসমূহ পরীক্ষিত ও অপরীক্ষিত উভয়ই হতে পারে।

দৃষ্টিভঙ্গিঃ সমাজে বসবাস করতে গিয়ে মানুষকে বিশেষ কতগুলো রীতিনীতি, আচার-আচরণ, প্রবণতা ও আদর্শ ইত্যাদি মেনে চলতে হয়। তাই যেসব বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংকল্প, মানুষের আচার আচরণ এবং কার্যাবলিকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলো সমষ্টিই হল সামাজিক মূল্যবোধ। এটি সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান। তাহলে দেখা যাচ্ছে বিশ্বাস → মূল্যবোধ → দৃষ্টিভঙ্গি → আচরণ। এখানে কোন একটি বিষয়কে মানুষ যে দৃষ্টি দিয়ে ঐ বিষয়টিকে দেখে সেটিই তার দৃষ্টিভঙ্গি। ব্যক্তির দর্শন থেকে তার দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম নেয়। মানুষের মূল্যবোধের উপর তার আচরণ ও অভ্যাস গড়ে ওঠে এবং ঐ বিষয়ের উপর সেই বিষয়টি ব্যবহার করে বা অনুশীলন করে। তখনই দৃষ্টিভঙ্গি সৃস্টি হয়। বিশ্বাসের ফলে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হতে পারে। আবার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আচরণের পরিবর্তন হতে পারে। অর্থাৎ সংস্কৃতির বিশ্বাস মানুষের দর্শনের ভীত হিসেবে যখন কাজ করে তখনই তার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের সহায়ক ভূমিকা রাখে।

সংস্কৃতির বিশ্বাস এবং সমাজ সংগঠন

সমাজতত্ত্ববিদ ও নৃ-তত্ত্ববিদরা সংগঠনকে সামাজিক প্রতিফলন হিসাবে মনে করেন। সাংস্কৃতিক বিশ্বাস হচ্ছে ধারণার চিন্তা ভাবনা যা অনেক ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায় এটি বিভিন্ন লোকদের মধ্যে জ্ঞানে অন্তক্রিয়ার মধ্যে দেখা যায়। সাধারণত সাংস্কৃতিক বিশ্বাস হচ্ছে একই ধরণের সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্যে চিহ্নিত হয়। সাংস্কৃতিক বিশ্বাস অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে। তবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিশ্বাস ও সামাজিক সংগঠনের মধ্যে সম্পর্কের পরীক্ষন হচ্ছে কঠিন বিষয়। যদি আমরা সাংস্কৃতিক বিশ্বাসকে সংজ্ঞা নিরূপণ করতে চাই তবে এগুলো হচ্ছে কতগুলো ঘটনার সমন্বয়। কীভাবে সাংস্কৃতিক বিশ্বাসকে সীমিত করা যাবে এবং এগুলোর উৎস কী আমাদের এ বিষয়ে যুক্তি ভিত্তিক হতে হবে।

এই ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে কতগুলো সংস্কৃতিক বিশ্বাস এর গুরুত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করা যেমন– বুদ্ধিভিত্তিক সাংস্কৃতিক বিশ্বাস যা বিভিন্ন অবস্থা যা ব্যক্তির প্রত্যাশার মধ্যে প্রকাশ পায়। যেহেতু সাংস্কৃতিক বিশ্বাস হচ্ছে একই ধরণের সেহেতু এর ধারক বাহকগণ সাংস্কৃতিক বিশ্বাসকে অবলম্বন করে। এগুলো হচ্ছে কতগুলো সাংস্কৃতিক বিশ্বাস ধারণা যেগুলো নিজেদের প্রয়োগ করতে হবে। এজন্য সাংস্কৃতিক বিশ্বাস এর নির্দিষ্ট দিকগুলোকে একটি সম্ভাবনা ধারণা হিসাবে আনুষ্ঠানিক রূপ দেয়া হয়। সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের প্রতিটি সম্ভাবনা ব্যক্তির কর্মকান্ডের মধ্য প্রকাশ পায়। প্রত্যেক ব্যক্তির সংস্কৃতির বিষয়ে প্রয়োগের ক্ষেত্রে অন্যদের কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করে। এই কারণে এর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজন রয়েছে যার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বিশ্বাস এবং কৌশলের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। অন্যান্য কৌশলের মতো না হলেও সাংস্কৃতিক বিশ্বাস গুলো হচ্ছে ব্যক্তির গুণাবলী। সাংস্কৃতিক বিশ্বাসগুলোকে কতগুলো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে সমন্বিত করা যায়, যার ফলে পরবর্তীতে কৌশলের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে। অতীতের সাংস্কৃতিক বিশ্বাস গুলো মূল দিকের ব্যবস্থা করে এবং এগুলো বিভিন্ন প্রত্যাশার সমন্বয় সাধন করে থাকে। আবার সামাজিক কর্মকান্ডের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে সামাজিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়।

এ সকল প্রতিষ্ঠানের কতগুলো সাংস্কৃতিক বিশ্বাস সমন্বয়ে গঠিত। পরিনামে সংস্কৃতিক কর্মকান্ড গুলো সংগঠনের প্রতিষ্ঠানিক উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবর্তন করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ এ সকল ক্ষেত্রে সামাজিক সংগঠন গুলোর নতুন নীতির প্রবর্তন করার ফলে নতুন সংগঠন চালু হয় এবং জ্ঞানের বৃদ্ধি পায় ও ব্যক্তি তাহার ইচ্ছা অনিচ্ছা সম্পর্কে জানতে পারে।

সাংগঠনিক প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে এ থেকে কিছু প্রত্যাশা করা। তাহাদের প্রত্যাশা গুলো তাহাদের সাংস্কৃতিক বিশ্বাস এর উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিশ্বাস এর কারণে সংগঠনিক উন্নয়ন ঘটে, সংগঠনের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়, এবং ঐতিহাসিক ভারসাম্যের সৃষ্টি হয়। যে মুহুর্তে নির্দিষ্ট সংগঠনের সৃষ্টির হয় পরবর্তীতে তা সংস্কৃতি নিয়ম কানুনকে প্রভাবিত করে সামাজিক সংগঠনের রূপ দেয়। সাংস্কৃতিক বিশ্বাস সামাজিক সংগঠনকে প্রভাবিত করে। এটি সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে ঘটে থাকে।

বিভিন্ন ধরণের সাংস্কৃতিক বিশ্বাস, বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর প্রভাবের ফলে উন্নত জীবন যাত্রা ও শিক্ষা উন্নয়নে পরিবেশ সৃষ্টি করে। সাংস্কৃতিক বিশ্বাস সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। যা সার্বজনীন মনে হলেও তা বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ফলে ব্যক্তি তাহাদের নৈতিক যুক্তিকতা খুজে পাবে এবং বিভিন্ন মূল্যবোধের কারণে নৈতিক মূল্যবোধ শক্তিশালী জোরদার হবে।

শিক্ষা উন্নয়নে সংস্কৃতির বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব

সংস্কৃতিক বিশ্বাসের সাথে মূল্যবোধ জড়িত। এই মূল্যবোধ থেকে ব্যক্তি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে নতুন সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখে। যা পরবর্তীতে পূর্বের সাথে ভাল মন্দ বিচার করার মত সামর্থ্য অর্জন করতে পারে। সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষা উন্নয়নের প্রয়োজন হয় যা দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবে প্রতিফলিত হয়। তাছাড়া সমাজ পরিবর্তনের সংস্কৃতির মাত্রা সাংস্কৃতিক দিকগুলোর পরিবর্তন নির্দেশ করে। আবিস্কার, উদ্ভাবন, নব প্রযুক্তি, অনাসাংস্কৃতির সাথে সংযোগ, সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি, অন্য সংস্কৃতি ধার করা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি ঘটে থাকে। এখানে নতুন নতুন সাংস্কৃতিক উপাদানে সংযুক্তি এবং পুরানো উপাদানের অপসারণ সংগঠিত হয়। যার ফলশ্রুতি সংস্কৃতিক বিশ্বাস থেকে দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের জন্ম দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে- শিক্ষায় শিক্ষন-শিখনে বিশ্বাস হল শিক্ষাদান করা যা পুরানো সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে শিক্ষন-শিখানো মানে অংশগ্রহণমূলক শিখন। এখানে শিক্ষক কেন্দ্রিক না হয়ে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক অর্থাৎ বিষয়বস্তু, শিক্ষার পরিবেশ, পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া, দলগত কাজ ও শিক্ষার্থী সক্রিয়করণ ইত্যাদি সবকিছু শিক্ষকের মানসিক সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করছে। ফলে শিক্ষার্থীর কল্যাণমুখী শিক্ষণের প্রতি তিনি ধীরে ধীরে মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে থাকেন। কারণ তার বিশ্বাস এভাবে গড়ে উঠেছে। তাই বলা যায় প্রথমে পরিবর্তন দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক থাকায় পরবর্তীতে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পাঠদানের প্রতি বিশ্বাস জন্মায়। এইভাবে সংস্কৃতিক বিশ্বাস থেকে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষা উন্নয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

সুতরাং দেখা যায় ব্যক্তির সংস্কৃতিক বিশ্বাস তার জীবন পরিচালনাসহ ও দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে গভীরভাবে বিস্তার করে। বিশ্বাসের সাথে মানুষের আধ্যাতিক চেতনা, নীতিবোধ, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহ্যগত এবং যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি জড়িত।

সংস্কৃতি মানুষের সার্বিক প্রচেষ্টার ফল, যার মাধ্যমে সে পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ-খাওয়ায় এবং জীবন প্রণালীকে উন্নত করে। এ কারণে ব্যক্তি এবং জীবন প্রণালীকে উন্নত করে। এ কারণে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সমাজের তথা দেশ ও জাতির শিক্ষা উন্নয়নের প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপটে শিক্ষা উন্নয়নে নিম্নে সাংস্কৃতির বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব বর্ণনা করা হলো।

১. **কাঙ্খিত আচরণের উন্নয়ন:** সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রন, অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি সৃষ্টি, বঞ্চিত ও কাঙ্খিত আচরণে রূপান্তর এসব সুষ্ঠ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের স্বার্থে মোকাবেলা করতে হয়। এগুলো সংস্কৃতির একটি অংশ। সংস্কৃতির বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে সামাজিক মার্যাদা হিসাবে প্রত্যাশিত আচরণ ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধান একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিফলন ঘটে। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিবর্তন আনয়ন ও শিখন সামগ্রী, তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা।

২. **আদর্শ জীবন মানের উন্নয়ন:** সামাজিক জীব হিসাবে মানুষকে অবশ্যই অর্জিত ও বর্জিত কিছু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হয় যা সংস্কৃতির মাধ্যমেই কেবল লাভ করা সম্ভব। এজন্য ব্যক্তির কতকগুলো গুণাবলি ও যোগাযোগের অধিকারী হতে হয়। সংস্কৃতিক বিশ্বাস সে সমস্ত গুণাবলি অর্জনের জন্য ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। শিক্ষাই ব্যক্তির পরিপূর্ণ জীবনের আদর্শ চিত্র তুলে ধরতে সহায়তা করে। যার ফলে শিক্ষাক্রমে বিষয়জ্ঞান সময়যোগী করে তুলতে পরিবর্তন আনতে হয়।

৩. **একাত্মবোধের উন্নয়ন:** সংস্কৃতি সমাজস্থ গোষ্ঠীর অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একাত্মবোধ সৃষ্টি করে গোষ্ঠীগত চেতনার উন্নয়ন ঘটায়। সংস্কৃতির দ্বারাই ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটে। শিক্ষার ফলে ব্যক্তির সামাজিক চেতনার সৃষ্টি হয় এবং এই চেতনার প্রভাবেই ব্যক্তি, পরিবার, রাষ্ট্র ও সমাজের সাথে একাত্ম হয়ে বসবাস করে। যার ফলে শিক্ষাক্রমে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সাথে সংযোগ বিধান করে আধুনীকরণ করতে হয়।

৪. **সামাজিক সংহতির উন্নয়ন:** সমাজ কাঠামোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শক্তি হচ্ছে সংস্কৃতি। সামাজিক সংহতি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি প্রসার ঘটে। যার ফলে সংস্কৃতিক বিশ্বাস সামাজিক সংহতি ও বন্ধনের উন্নয়ন ঘটায়। গোষ্ঠীর মাধ্যমেই সামাজিক বন্ধন অটুট থাকে এবং এই ভিত্তিতেই সামাজিক সংহতি শক্তিশালী হয়। এ জন্য শিক্ষা উন্নয়নে সামাজিক গোষ্ঠীর জীবনের অস্তিত্ব অনেকাংশ সংস্কৃতির বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল।

৫. **ধর্মীয় চেতনার উন্নয়ন:** সংস্কৃতি সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে জ্ঞানার্জনের আগ্রহ সৃষ্টি করে। ধর্মীয় চেতনায় সৌন্দর্যবোধ ও নৈতিক গুণাবলির জন্ম দেয়। যার ফলে দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের মাধ্যমে সংস্কৃতির বিশ্বাস ব্যক্তি জীবনে গতিধারায় পরিবর্তিত হয়। এর প্রভাবে ব্যক্তি, সমাজ এমনকি রাষ্ট্রীয় জীবনেও পরিলক্ষিত হয়। এ প্রেক্ষিতে ধর্মীয় চেতনাবোধ যেমন– সন্ত্রাস, সহিংসতা, জঙ্গিবাদ ও আদর্শগত শিক্ষা শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভূক্ত করতে হয়।

৬. **সামাজিক মূল্যবোধ উন্নয়ন:** বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এগুলো লালন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংস্কৃতির বিশ্বাস ব্যক্তির আচরণকে গোষ্ঠীর, দেশ ও জাতির উপযোগী আচরণে রূপান্তর করে। আবার সংস্কৃতি ব্যক্তির অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, যৌন জীবন এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এসব ক্ষেত্রে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সংস্কৃতির ভূমিকা অন্যতম। যার ফলে শিক্ষানীতিতে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিবর্তনসহ শিক্ষাক্রমে নতুন নতুন শিক্ষার কৌশল আনতে হয়।

৭. **সামাজিক রীতি-নীতি উন্নয়ন:** সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রতিটি মানুষ সমাজ প্রত্যাশিত আচরণর সাথে পরিচিতি হওয়ার সুযোগ লাভ করে। তাছাড়া সংস্কৃতিই সমাজস্থ মানুষের সামাজিক আচার-আচরণ, রীতিনীতি বিভিন্ন ঘটনা ও উপাদান এবং প্রয়োজনীয় পরিবেশ নির্দিষ্ট করে মানুষকে সুষ্ঠুভাবে চলার পথ সুগম করে দেয়। ফলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঘটনার মাধ্যমে মানুষ সমাজ প্রত্যাশিত রীতিনীতি ও আচরণ আয়ত্ব করে থাকে। পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষায় বিভিন্ন দেশের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষিত বিষয়বস্তু শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভূক্তি করা হয়।

৮. **সামাজিক সম্পর্ক বা সৌহার্দ্য বোধের উন্নয়ন:** সংস্কৃতির মাধ্যমে সমাজস্থ মানুষের বিভিন্ন ঘটনা, আচার-অনুষ্ঠান, সভা ও সম্মেলন প্রভৃতির মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতিবোধ সৃষ্টি করে। এর ফলে সামাজিক বিশৃংখলা হ্রাস পায়। মানুষের প্রতি আন্তরিকতা বৃদ্ধি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে। সমাজ জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সমাজের স্বার্থে একই বন্ধনে আবদ্ধ ও চালিত করার মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক ও সৌহার্য্যবোধের উন্নয়ন ঘটায়। ফলশ্রুতিতে শিক্ষাক্রমে বিভিন্ন দিবসের তাৎপর্য এবং উদযাপনের নির্দেশনা দেওয়া হয়।

৯. **মর্যাদার উন্নয়ন:** সংস্কৃতি বিশ্বাস সমাজে প্রতিটি মানুষ একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জাগ্রত করে থাকে। শ্রদ্ধাবোধ, সম্মান দেখানো, সহানুভুতি প্রভৃতি দৃষ্টিভঙ্গির উপাদান। আর এটি সমাজের মানুষের জীবন রীতির ভিত্তিতে বিষয় কেন্দ্রিক প্রক্রিয়ার নির্ধারিত হয়। ফলে প্রতিটি মানুষই সমাজস্থ মর্যাদাবান এবং

উন্নত ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও গুণাবলীর অধিকারী হতে শিক্ষাই জাগ্রত করে থাকে। যার ফলে শিক্ষাক্রমে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে দিক নির্দেশনা দেওয়া আছে।

১০. **ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন:** শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হলো ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ যেন সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়। সাংস্কৃতিক বিশ্বাস সমাজের প্রতিটি মানুষের অন্তর্গত শক্তি বিকাশে প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং উপকরণগুলো সহজ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যক্তিত্ব উন্নয়নে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সাংস্কৃতিক বিশ্বায়ন ও শিক্ষা

বিশ্বায়ন বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্য পারস্পরিক যোগাযোগ ও নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির এক সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। বিশ্বায়ন পুরো বিশ্বকে একই ছাতার নীচে নিয়ে এসেছে যা ঐক্য বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। বিশ্বায়ন শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতিক বিনিময়ের নতুন-নতুন সুযোগ এবং নতুন প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণা বিনিময়ের দারুন সুযোগ তৈরি করেছে। তথ্য বিপ্লব এবং অল্প কিছু রাষ্ট্র এবং প্রতিষ্ঠানের হাতে যে শক্তি কেন্দ্রিভূত হচ্ছে তার ফলে এক নতুন সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে। এই নতুন সাম্রাজ্য আমাদের মূল্যবোধ, ভাবনা, জীবনধারা, প্রতিষ্ঠান, অর্থনীতি, সংস্কৃতি সব কিছুই বদলে দিচ্ছে। বিশ্বে সামাজিক সম্পর্ক এবং বিনিময়ের ব্যাপ্তি, গভীরতা, গতি এবং প্রভাব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। নতুন নতুন নেটওয়ার্কে এবং যোগাযোগের গ্রন্থি সৃষ্টি হচ্ছে। ম্যানুয়েল ক্যাসেল এবং অ্যান্থনি গিডেন্সের মতে জ্ঞান এবং বিশেষ ব্যবস্থা ও যোগাযোগের ভিত্তিতে এক নতুন সমাজ গড়ে উঠেছে। এই সমাজকে জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ বলা হয়। যদিও পশ্চিমে উৎপত্তি, এটি ক্রমশঃ যোগাযোগের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। বৃহত্তর স্তরে ও বহু সমাজের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মানুষ সব সময়েই একে অপরের সাথে যোগাযোগ করছে এবং তারা পূর্বের তুলনায় অধিক বেশী পারস্পরিক সহযোগিতা অর্জন করেছে। বিশ্বায়ন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একে অপরের পাশাপাশি অবস্থান। অর্থাৎ বিশ্বায়নের অন্তরে সংস্কৃতির অবস্থান, আবার সংস্কৃতির অন্তরে বিশ্বায়নের অবস্থান। তাই সংস্কৃতির বিশ্বাসের উপর সমাজ উন্নয়নে প্রচেষ্টা চলছে। আবার বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির ভিত্তিতে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের প্রসার ঘটছে। যার ফলশ্রুতিতে শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নে আমূল পরিবর্তন এসেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় শিক্ষকদের যে কোন সভায় শিক্ষার্থীদের কল্যাণের চেয়ে অনেক বেশি আলাপ হয়, পরোক্ষ নিন্দা এবং বেতনের ব্যাপারে অভিভাবকগণ শিক্ষকদের প্রতি সম্মান দেখায় না, যা দেখাত পূর্বে। একইভাবে বাবা ও মায়ের সাথে সন্তানের, বোনের সাথে ভাইয়ের, স্বামীর সাথে স্ত্রীর, প্রভুর সাথে ভৃত্যের এবং সমাজের আরো নানা দিকের সম্পর্কে যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। এখন অনেকেই প্রাচীন ভাবভঙ্গি বাদ দিয়ে উদার নীতি গ্রহণ করতে শুরু করেছে। এভাবে সময় এবং স্থান ভেদে সংস্কৃতির অনেক উপাদান বদলে গেছে এবং যাচ্ছে।

পৃথিবীর অনেক দেশের সংস্কৃতির মত ভারতীয় সংস্কৃতির কিছু উপাদানও অপরিবর্তনীয়। বৈদেশিক শাসন চলাকালীন সময়ে দেশে শিক্ষা পদ্ধতির এ শাশ্বত উপাদানকে অবজ্ঞা করা হত। মুসলিম এবং ব্রিটিশ শাসন চলাকালে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায়, তা এর একটা জলন্ত সাক্ষ্য। অনেক ব্রিটিশ দলিলে বিশেষভাবে নির্দেশ করা হয়েছে যে, তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করা এবং তাদের লক্ষ্য ছিল ভারতীয়দের পাশ্চাত্য সাংস্কৃতির উপকারিতা শিক্ষা দেয়। এজন্য তারা দেশে কিছু নির্দিষ্ট শিক্ষা পদ্ধতি চলু করে। এ প্রেক্ষিতে ভারতীয়তরা তাদের স্বকয়ি সংস্কৃতির প্রতি বিশ্বাস অনেকটা হারিয়ে ফেলে।

বস্তুত একটা দেশের নিজস্ব সংস্কৃতির জন্য ভালবাসা বৃদ্ধি করতে হবে শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে। কারণ এটা জাতীয়বোধকে সুদৃঢ় করে। দেশকে শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধিশালী করতে হলে প্রয়োজন স্বদেশানুরাগের জীবনীশক্তিকে লালন। এ সাহস একজনকে তার নিজ দেশের অপ্রাচুর্যতার প্রতি অন্ধ রাখতে পারে না। প্রতিটি দেশেরই বিভিন্ন ধরণের সমাজ, বর্ণ, শ্রেণি এবং কৌতূহল থাকে। স্বদেশানুরোগের অভাবে অনেক লোক জাতীয়তা বোধকে অবজ্ঞা করে। এতে ভারতীয় কিছু বিধান নিশ্চিয়তা দেয় সমস্ত ধর্ম এবং সমাজকে রক্ষার। কিন্তু এটা

দেশের সংস্কৃতিকে রক্ষণের জন্য অপর্যাপ্ত। দেশের সংস্কৃতির প্রতি ভালবাসা থাকা প্রয়োজন। এটা সম্ভব শিক্ষা পদ্ধতিতে স্বদেশানুরাগের গ্রহণের মাধ্যমে।

ভারতীয় সংস্কৃতি শিক্ষাসূচিতে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিকে অপর্যাপ্ত মনে হয়। এতে হিন্দুরা বিবেচনা করে তাদেরকে ভারতীয় প্রথম এবং তারপর মুসলিম এবং খ্রিষ্টান। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জাপান এবং ফ্রান্সের শিক্ষার ইতিহাস নির্দেশ করে যে, এসব দেশের লোকজন সুনির্দিষ্ট কিছু প্রথা বিশ্বাস করে। সুতরাং শিক্ষা পদ্ধতিতে এসব প্রথাকে রক্ষা করার জন্য যথার্থ মনোযোগ দেয়া হয়। প্রসঙ্গত বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতিতে সংস্কৃতিবোধের ভিত্তিমূল দেখা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত গ্রন্থাবলীতে ধর্মীয় বিশ্বাস, আদর্শ, সামাজিক মূল্যবোধ এবং বিভিন্নতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। এ চেষ্টায় দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সাংস্কৃতিক ভিত্তি দৃঢ় হবে। এ ভিত্তির অভাব থাকলে শিক্ষা পদ্ধতিকে জাতীয় পর্যায়ে উন্নীত করা কঠিন।

স্যাটেলাইট, মোবাইল, ইন্টারনেট ও তথ্য-প্রযুক্তির উন্নতি ও অগ্রগতির ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে উন্নত ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অবাধ অনুপ্রবেশ ঘটছে। ফলে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভালো দিকগুলো প্রভাবে দেশীয় সংস্কৃতির পরিপুষ্ট হচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে ক্রমান্বয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং বিশ্বায়নের প্রভাবে জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

উপসংহার

বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞানের আবিস্কারের ফলে সংস্কৃতির উপরি কাঠামোর ব্যাপকতর পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তাই সংস্কৃতি বিশ্বাস মানুষের এমন একটি অনুশীলন কর্ম যা মানুষকে সুন্দরভাবে ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সমাজের সদস্যদের মনোভাবের আদান-প্রদান ও পারস্পরিক সহযোগিতামূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেয়। যার ফলে ভাল মন্দ বিচার, বর্জন ও গ্রহণে একটি ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করে। এতে সমাজে বসবাসরত মানুষের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন ঘটে। সমাজের চাহিদার সাথে সমাজের বিদ্যমান বিভিন্ন বিষয়াদির পরিবর্তন ও উন্নতকরণের প্রয়োজন হয়। তখনই সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষার ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে হয়। শিক্ষার ব্যবস্থার উন্নয়নে সংস্কৃতি বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে সমাজের বিদ্যমান নানান বিষয়ে পশ্চাৎপদতাকে পিছিয়ে ফেলে উন্নতর পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারনে বিশ্বায়নের ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থার দিন দিন পরিবর্তন হচ্ছে। উন্নত দেশগুলো অনুনন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সমাজের সংস্কৃতি বিকাশে শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রেখে চলছে। পরিশেষে বলা যায়, প্রতিটি দেশ তার সমাজস্থ ব্যক্তিদের সংস্কৃতি বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে প্রতিনিয়ত শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নীতকরণের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৮

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. "মানব সৃষ্ট সব কিছুর সমষ্টিই সংস্কৃতি"– এই উক্তটি কে করেছিলেন?

ক. জোনস

খ. ম্যাকাইভার

গ. হোবেল

ঘ. রবার্টসন

২. সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের ফলে-

i. সাংগঠনিক উন্নয়ন ঘটে

ii. সংগঠনের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়

iii. ঐতিহাসিক ভারসাম্য সৃষ্টি হয়

নীচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৩. শিক্ষা উন্নয়নে সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান-

i. আদর্শ জীবনমানের উন্নয়ন

ii. সামাজিক রীতি নীতির উন্নয়ন

iii. রাজনৈতিক রীতি নীতির উন্নয়ন

নীচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৪. "জ্ঞান এবং বিশেষ ব্যবস্থা ও যোগাযোগের ভিত্তিতে এক নতুন সমাজ গড়ে উঠেছে"– এই বক্তব্যটি কাদের?

ক. এস সি পাল এবং ডেভিড

খ. ডেভিড এবং ক্যাসেল

গ. ম্যানুয়েল ক্যাসেল এবং অ্যান্থনি গিডেন্স

ঘ. অ্যান্থনি গিডেন্স এবং ডেভিড

উত্তরমালা: ১. ক, ২. ঘ, ৩. ক, ৪. গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বিশ্বাস কী?
২. দৃষ্টিভঙ্গি বলতে কী বোঝায়?
৩. সংস্কৃতিক বিশ্বাস বলতে কী বোঝায়?
৪. শিক্ষা উন্নয়নে সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের ভূমিকা বর্ণনা করুন।
৫. শিক্ষা ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের একটি উদাহরণ তৈরি করুন।
৬. বিশ্বায়নে সংস্কৃতির প্রভাব উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. সংস্কৃতিক বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।
২. সংস্কৃতিক বিশ্বাস ও সমাজ সংগঠনের সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।
৩. শিক্ষা উন্নয়নে সংস্কৃতিক বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি কতটুকু প্রভাব কার্যকর বলে আপনি মনে করেন সে ব্যাপারে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।
৪. সাংস্কৃতি বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে শিক্ষা উন্নয়নে প্রসার ঘটায় তা বিশ্লেষণ করুন।
৫. সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নে শিক্ষার ভুমিকা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৫.৯: শিক্ষা উন্নয়নে সহায়তা: শর্তযুক্ত ও বহুপাক্ষিক সাহায্য করা
Education Development Assistance: Tied Aid and Multilateral Aids

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি−

- শর্তযুক্ত (Tied Aid) কী-তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বহুপাক্ষিক সাহায্য (Multilateral Aid)-এর প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিশ্বায়নে শিক্ষা উন্নয়নে বহুপাক্ষিক সংস্থার বৈদেশিক সাহায্য এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- শিক্ষা উন্নয়নে বহুপাক্ষিক দাতাদেশ এবং অংশীদারিত্বের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

বিশ্বায়নে এ যুগে আর্থ-সামাজিক ও সামাজিক সংস্কৃতি উন্নয়নের লক্ষে শিক্ষা উন্নয়নের প্রেক্ষাপট দ্রুততার সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে। এতে উন্নত দেশে সাথে উন্নয়নশীল দেশ একে অপরের সাথে সংযুক্ত হচ্ছে। আর্থ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এ ধারার সাথে সংগতি রেখে পূর্ণগঠিত হচ্ছে। দেশে দেশে শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উপাদান সংযুক্ত হচ্ছে। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার ভূমিকা জোরদারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে চলছে। সাথে সাথে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করছে। এই ক্ষেত্রে শর্তযুক্ত সাহায্যে ও বহুপাক্ষিক সাহায্য চলমান শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নয়নে গতিময় করে তুলছে। শিক্ষা উন্নয়নে সহায়তাকারী সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে শিক্ষার বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতের প্রধান দিকসমূহ আলোচনা করা হল।

শর্তযুক্ত সাহায্য (Tied Aid)

যখন প্রদত্ত সাহায্যে বিশেষ পণ্য সামগ্রী ক্রয় বা বিশেষ প্রকল্পে ব্যয় করার শর্তযুক্ত করা হয় সেটাকে ব্যয়ের দিক থেকে শর্তযুক্ত সাহায্য বলা হয়। প্রায় একইভাবে দাতাদের নির্ধারিত বিশেষ দেশ থেকে পণ্য সামগ্রী ও সেবা ক্রয়ের শর্তে যে সাহায্য প্রদান করা হয় তাকে উৎসের দিক থেকে শর্তযুক্ত সাহায্য বলা হয়। সাধারণত প্রকল্প বহির্ভূত সাহায্যগুলোকে শর্তযুক্ত সাহায্য বলে। আবার গ্রহীতা দেশ সাহায্যের অর্থ দিয়ে নিজেদের পছন্দমতো যে কোনো পণ্য সামগ্রী যে কোন দেশ থেকে ক্রয় বা সেবা নিতে পারে। এ ধরণের সাহায্যকে শর্তহীন (United) সাহায্য বলে। তবে বৈদেশিক সাহায্যকে শর্তযুক্ত ও শর্তহীন এভাবে বিভক্ত করার যায় না কারণ প্রদত্ত সাহায্য আংশিকভাবে শর্তযুক্ত এবং আংশিকভাবে শর্তহীন হতে পারে। শর্তযুক্ত সাহায্য সাধারণতঃ বৈদেশিক সাহায্য যা দাতাদেশ অথবা দলভূক্ত নির্বাচিত দেশ থেকে প্রদত্ত সাহায্য গ্রহীতা দেশ ব্যয় করে থাকে। ২০০৬ সালে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা অনুমান করেন যে বৈদেশিক সাহায্যের অফিসিয়াল উন্নয়ন সহায়তার (ODA) ৪১.৭ শতাংশ শর্তহীন হয়। শর্তযুক্ত ঋণ অথবা অফিসিয়াল ঋণ অথবা সহযোগিতামূলক অর্থায়ন প্যাকেজে কিছু সীমিত সংখ্যক দাতাদেশ পণ্য বা সেবা সরবরাহের সাথে জড়িত।

বহুপাক্ষিক সাহায্য (Multilateral Aid)

বহুপাক্ষিক সাহায্য হলো বৈদেশিক সাহায্য যা ঋণ বা অনুদান বা পণ্য ও সেবা স্থানান্তর, উপহার হিসেবে তহবিল স্থানান্তর ইত্যাদি ইলডিসিকে (Economical Least Development Country) তাদের অর্থনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য অর্জন করতে সাহায্য করে। দাতা দেশগুলোর সরকারের এই ধরণের সাহায্যকে অফিসিয়াল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিন্ট্যান্স (ODA) বলা হয়। ODA-এর মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশ সমূহের কাছে ঋণ বা সাহায্য পৌছে দেওয়া হয়। এখানে দ্বিপাক্ষিক সাহায্য মাত্র একটি দাতা দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের (ELDC) গ্রহীতা দেশকে ঋণ বা সাহায্য বুঝায়। উদাহরণ: বহুপাক্ষিক সহায়তা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দাতা দেশ উন্নয়নশীল দেশে (ELDC) সাহায্য বা ঋণ হিসেবে প্রাপ্ত হন। যেমন- উন্নত দেশসমূহ, জাতিসংঘ সংস্থা, জাইকা, আইএমএফ, সেভ দি চিলড্রেন (USA), ইউরোপিয়ান কমিশন, বিশ্ব ব্যাংক সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা। এই ধরণের সাহায্য উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন প্রোগ্রামে দীর্ঘমেয়াদি গৃহীত প্রকল্পে কম সুদে ঋণ বা সাহায্য বা কারিগরি সাহায্য বা মানবিক জরুরী সাহায্য ODA এর মাধ্যমে বিতরণ বা বরাদ্দ দিয়ে থাকেন। যেমন– ২০০৮ সালে আইরিস (ODA) সাহায্যে হিসেবে £ ১৭.১ মিলিয়ন UNICEF-কে শিক্ষা উন্নয়নে ব্যয় করার জন্য প্রদান করেছিল।

তাছাড়া বেসরকারী সংস্থা (NGOs) শিক্ষা উন্নয়নে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এনজিও সাধারণত অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল, প্রাক্তন অক্সফাম ও ODA প্রচার করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংগঠন। এনজিও সাহায্যের প্রদানকারী হিসাবে ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা উন্নয়নের জন্য কারিগরি সহায়তা, নারী উন্নয়ন অধিকার, শিশু অধিকার, মানবাধিকার ও টেকসই উন্নয়নে সমর্থন করে বা জড়িত হয়। যেমন ২০০৮ সালে আইরিশ (ODA) সাহায্য হিসাবে £ ২৪.৫ মিলিয়ন অর্থ উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষা উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজে ব্যবহার করার জন্য দেওয়া হয়ে থাকে। বাংলাদেশের ব্র্যাক শিক্ষা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

বহুপক্ষীয় সাহায্য হিসাবে অস্ট্রেলিয়া আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রকল্প হচ্ছে অন্যতম একটি বৈদেশিক সহায়তাকারী দেশ যাহা সূচনা মূলকভাবে বিশ্বের পশ্চিমা শিল্পায়িত দেশসমূহ শুরু করেছিল। ইহা এশিয়া পেসিফিক অঞ্চল (APR) এবং পূর্ব এশিয়ার দরিদ্র অঞ্চল এর উন্নয়নে দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকান এবং মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ দৃষ্টি রাখেন। ১৯৮০ দশকের প্রথম দিকে অষ্ট্রেলিয়া ৮৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সম-পরিমাণ সহায়তা হিসাবে অবদান রেখেছিল যাহা পরবর্তীতে ১৯৯৭-১৯৯৮-তে ১,৪২৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে বৃদ্ধি করা হয়েছিল। আবার ২০০৬-২০০৭ সালে এই সহায়তা ২,৯৪৬ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা হয়। যা বিশ্বব্যাপী ৫৮ মিলিয়ন মানুষের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এই সহায়তা প্রকল্প বিভিন্ন স্তরে উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন দেশসমূহ অত্র সহায়তা গ্রহণ করেছে।

অষ্ট্রেলিয়া সহযোগিতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক অংশীদারীত্বের সাথে দারিদ্রতা কমানো, মান সম্মত জীবিকা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য উন্নয়নশীল দেশসমূহ যাতে অর্জন করতে পারে সেজন্য World Summit on Sustainable Development গঠন এবং গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন।

বিশ্বব্যাপী বহুপক্ষীয় সহায়তা নিয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা অন্যান্য দেশসমূহ অর্থ বিতরণ করে থাকে। যেমন– জাতিসংঘ, বিশ্ব ব্যাংক এবং কমনওয়েলথ এর মাধ্যমে সহায়তার জন্য যাহা আঞ্চলিক দ্বিপক্ষীয় সাহায্যের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। উন্নয়নশীল দেশসমূহ আন্তর্জাতিক সংস্থার বহুপাক্ষিক সহায়তা দ্বিপাক্ষিক সহায়তা থেকে পৃথকভাবে সকল অফিসিয়াল উন্নয়ন সহায়তা হিসাবে সরবরাহ করা হয়। এগুলো হলো– জাতিসংঘের মানবিক সংস্থা, মাল্টিলেটারাল উন্নয়ন ব্যাংক (MDB) যেমন বিশ্ব ব্যাংক, এডিবি (Asian Development Bank) এবং কমনওয়েলথ সংস্থাসমূহ। অস্ট্রেলীয় সহায়তা তাদের বাজেটের প্রায় ৩০ শতাংশ বহুপক্ষীয় বিশ্ব প্রোগ্রামে ব্যয় করে থাকে। যে সমস্ত দেশ উন্নয়নের দরকার যেমন– শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, কৃষি, বনায়ন এবং মৎস্য খাতসমূহে মূলত এই সহায়তা প্রদান করে থাকে। আবার অষ্ট্রেলিয় সাহায্যে উন্নয়নশীল

দেশসমূহের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে দাতাদেশের সহায়তা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বিশ্ব উষ্ণায়ন ইত্যাদি খাতে দিয়ে থাকে। এ ধরণের সংস্থা যেমন– International Development Association (IDA), The Asian Development Fund (ADF) & The Global Environment Facility (GEF). জাতিসংঘ দাতা দেশগুলোর মধ্যে অষ্ট্রেলিয়াকে বৈদেশিক সাহায্য উন্নয়নে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি বৃহৎ সুযোগ প্রদান করেছে। তাছাড়া ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, ইউএনডিপি ও উন্নত দেশসমূহ উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষা উন্নয়নে বিভিন্ন স্তরের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে।

বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা উন্নয়নে বহুপাক্ষিক সংস্থার বৈদেশিক সাহায্য

বৈদেশিক সাহায্যের উৎস বহু ও বহুমূখী একক দেশ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, সৌদি আরব ইত্যাদি ধনী দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশে ঋণ, অনুদান, কারিগরি সহায়তা দিয়ে ও মানবিক জরুরী সাহায্য সহায়তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আবার বহুপাক্ষিক সংস্থা উন্নয়নশীল দেশভূক্ত দেশকে বিভিন্ন শিক্ষা উন্নয়নে সহজ শর্তে ঋণ, অনুদান, কারিগরি সহায়তা ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

শিক্ষা সংক্রান্ত প্রধান দিকসমূহ:

- আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন (১৯৭১-১৯৭২)
- শিক্ষাক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার
- শিশু অধিকার কনভেশন ১৯৮৯ এ শিশুর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি
- সবার জন্য শিক্ষার বিশ্ব ঘোষণা ১৯৯০
- উচ্চ জনসংখ্যায় নয়টি উন্নয়নশীল দেশের (বাংলাদেশ, ব্রাজিল, চীন, মিশর, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া ও পাকিস্তান) প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন ও মৌলিক শিক্ষার জন্য দিল্লী ঘোষণা ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৩
- জাতিসংঘের শিক্ষা ও বিজ্ঞান সংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO) ১৯৯৩ সালে ফ্রান্সের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি ও ইউরোপীয় কমিশনের প্রাক্তন সভাপতি জ্যাক দেলর (Jaeques Delors)-কে চেয়ারম্যান এর দায়িত্বে "একুশ শতকের শিক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশন" (১৯৯৩-১৯৯৬) নিয়োগ করেন।
- বিশ্বভিত্তিক মানব উন্নয়ন সাধনে একটি বিশ্ব অংশীদারীত্ব ব্যবস্থা সংগঠন হিসাবে এবং বিশ্বের দেশে দেশে ৮টি উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণ (The Millennium Development Goals) এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘভূক্ত দেশগুলো সর্বসম্মতিক্রমে "সহস্রাব্দ ঘোষণা" (The Millennium Declaration) গ্রহণ করে।

'সহস্রাব্দ ঘোষণায়' লক্ষ্যগুলোর মধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন, লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে শিক্ষার গুরুত্ব, ক্ষেত্রে ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বের সর্বত্র বালক-বালিকা, সকলের প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্ত করার নিশ্চয়তা বিধান এবং ২০০৫ সালের মধ্যে শিক্ষায় সকল স্তরে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ। এসব উন্নয়নের জন্য একটি বিশ্ব অংশীদারত্ব ব্যবস্থা গঠনের মাধ্যমে অর্জন করা।

তবে উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ গউএং কে সামনে রেখে শিক্ষা উন্নয়নে কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা সময়কাল ২০১০-২০২১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ধরা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য মধ্যম আয় দেশ হিসাবে পৌছতে ২০২১ সালের মধ্যে মাথাপিছু আয় ২০০০ ইউএস ডলার এবং জিডিপি ৮% হতে ১০% উন্নীতকরণ করতে হবে। তাছাড়া সবার জন্য শিক্ষা এই আলোকে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে শিক্ষার্থী শতভাগ অর্জন করতে হবে। অর্থনৈতিকভাবে শিক্ষা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উন্নয়ন বাজেটে ঘাটতি পূরণে ODA গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

করে থাকে। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, এই ঘাটতি পূরণের জন্য ৮৭৪.৮৪ বিলিয়ন টাকার দরকার (US $ 12.50 billion)। বাংলাদেশ প্রতি বছর অতিরিক্ত ৪.৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার প্রয়োজন হয়। তবে বার্ষিক ইউএস ডলার ২ থেকে ২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ ODA থেকে পেয়ে থাকে। আর বাকী অনুদান বা নিজস্ব রাজস্ব আয় থেকে অর্থের সংকুলান করতে হয়। এইক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, ইউএনডিপি, জাইকার মত বিভিন্ন সংস্থা বা দেশ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা উন্নয়নে (২০১০-২০২১) কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দিক নির্দেশনা বিদ্যমান।

ফলশ্রুতিতে বিশ্ব ব্যাংক (W.B) বাংলাদেশে শিক্ষা সংক্রান্ত ১৪ প্রকল্পে (কম বেশী হতে পারে) ৬৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর তহবিল প্রদান করেন। এই সহায়তা মূলত কারিগরি, বৃত্তিমূলক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হয়। এই সমস্ত প্রকল্পগুলো শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কম খরচে স্কুল নির্মাণ, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ শক্তিশালীকরণ, পাঠ্যবই ডিজাইন ও সংস্কার, এবং শিক্ষাক্রম উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। এতে স্কুলে শিশুদের সংখ্যা বৃহৎ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রতিক প্রকল্পসমূহ কারণে শিক্ষায় শেখার মান বৃদ্ধির উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করা হয়েছে। ১৯৯৩ সালে বিশ্বব্যাংক নারী শিক্ষা বিস্তারে মহিলা তালিকাভূক্তি এবং সমাপ্তির বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফিমেল সেকেন্ডারী স্কুল এসিসট্যান্স প্রজেক্ট যুগান্তকারী পদক্ষেপ। প্রকল্পের উপবৃত্তি এবং মেয়ে শিশুদের জন্য সব স্কুল সংশ্লিষ্ট ব্যয়ভার বহন করা হয় যাহা একটি সরকারের সমর্থিত কর্মসূচি। কর্মসূচি প্রকল্পের সমর্থন করে মহিলা ভর্তির মধ্যে বৃহৎ বৃদ্ধির ফলে বিয়ের বয়সে দীর্ঘসূত্রিতা, একক শিশু পরিবারের উচ্চতর সংখ্যা, শিশু জন্ম গ্যাপ উন্নত হয় এবং আরো নারীগণ উচ্চ আয়ের সঙ্গে নিয়োজিত হয়।

২০১৬ সালে বিশ্ব ব্যাংক দল হাজার কোটি মার্কিন ডলার বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষা খাতে শিক্ষক মান উন্নতিকরণ, শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ সাধন ও গবেষণা উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

বিশ্বব্যাংক বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় তার কাজ অব্যাহত রেখেছে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে এবং নতুন জ্ঞান অর্জন করতে প্রাপ্ত বয়স্কদের সুযোগ প্রদান করছে।

বর্তমানে এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) অর্থায়নে বাংলাদেশে Teaching Quality Improvement in Secondary Education & Secondary Education Sector Improvement Program TQI-II-এ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া এই ব্যাংকটি এশিয়ার স্বল্প আয়ভূক্ত দেশসমূহকে শিক্ষা উন্নয়নে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

ইউনিসেফ (UNICEF) উন্নশীলদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। তার মধ্যে বাংলাদেশে এমডিজি ২ ও ৩ অর্থাৎ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও লিঙ্গ বৈষম্য দূরকরণ শিক্ষা অর্জনে সহায়তা প্রদান করে থাকে। ইউনিসেফ একটি সরকার চালিত প্রকল্প গড়ে তোলার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য কাজ করে থাকে, তাকে দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (পিইডিপি- ২) বলা হয়। এই পিইডিপি- ২ লক্ষ্য হলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার, অংশগ্রহণ ও সমাপ্তির মাধ্যমে দেশের সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার মান নিশ্চিত করা। পিইডিপি- ২ এ বাংলাদেশে ৬৪টি জেলা জুড়ে ১.৮ বিলিয়ন ইউএস ডলার ব্যয় করার মাধ্যমে ৬৫০০০ সংখ্যক বিদ্যালয়ে ১৭.৭ মিলিয়ন শিশু এবং ৩১৫৫০০ শিক্ষককে উন্নীতকরণ। এ কাজটি ইউনিসেফসহ ১১টি দেশ বা সংস্থার অংশীদারিত্বের মাধ্যমে একত্রে প্রশিক্ষণ, সামাজিক সংহতি, স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ জড়িত এবং সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা করে থাকে। ইউনিসেফ মাধ্যমিক পর্যায়ে জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা, শিশু বিবাহ প্রতিরোধ, বয়ঃসন্ধিকালের বৃত্তিমূলক শিক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

বহুপক্ষীয় দাতাদেশের এবং অংশীদারীত্ব

বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশসমূহের অস্ট্রেলিয়ান সরকার, ১১টি দাতাদেশ একটি সাহচর্য নেতৃত্বে এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক (ADB), জাপানি সরকার, ইউনিসেফ, নেদারল্যান্ড, সুইডিস সরকার, কানাডিয়ান আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এবং জাতীয় এনজিও (NGOs), বাংলাদেশের রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক) সহ অন্যান্য সংস্থা বিশ্বব্যাপী শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষক মর্যাদা, গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করণ, একীভূত শিক্ষা, নারী শিক্ষা, সুবিধা বঞ্চিত শিশুর গুরুত্ব, ই-ল্যানিং, আইসিটি ব্যবহার প্রভৃতি শিক্ষা খাতে উন্নয়ন কর্মসূচীতে সাহায্য বা ঋণ প্রদান করে যাচ্ছে।

২০০২ সালে The Global Parternership for Education (GPE) গঠিত হয়। এই বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো সকলের জন্য শিক্ষা এবং উন্নয়ন খাত হবে সমলোচনার দৃষ্টিতে একমাত্র ভূমিকা। জিপিই বিশ্বাস করে মানব সমাজ সংক্রান্ত পেশাগত শিক্ষণ, বেসরকারী খাত, দুর্বল সম্পদ এবং ধারণ করার জ্ঞান যা বিশ্বায়ন ও জাতীয়তা উভয়ই একত্রে মূল্য আনয়ন করে দাতা দেশের সরকারের সাথে উন্নয়নশীল দেশের সরকারসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে। শিক্ষার গুণগত সাথে প্রত্যেক শিশুর প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য এবং অর্জনের কৌশলগত পরিকল্পনা এ্যাপোচের মাধ্যমে সমন্বয় করা হয়ে থাকে। শিক্ষাব্যবস্থা আর্থিক উৎসর্গ করার একমাত্র বিশ্বব্যাপী বহুপাক্ষিক সম্মিলিত ভাবে অর্থ যোগান এর অদ্বিতীয় অংশীদারিত্ব যা উন্নয়নশীল দেশসমূহে গুণগতভাবে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করে। ২০১৩ সালে মে মাসে জাতিসংঘের মহাসচিব কর্তৃক আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব গঠন ও জিপিই এর গুরুত্ব ভূমিকা পালন স্বীকৃতি প্রদান করে থাকে। তারপর ২০১৫ সালে জাতসিংঘ (UN) জিপিই একটি কারিগরী বহু অংশীজা অর্থ যোগানে অংশীদারীত্বের মাধ্যমে ২০১৫ এর উন্নয়ন স্বপ্নের যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ও উন্নয়নের কার্য প্রণালীতে স্বাক্ষর করে থাকে। এ আলোকে জিপিই কৌশলগত পরিকল্পনায় সুবিধাবঞ্চিত শিশু, নারী শিশু, শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতা এবং সংঘাতময় দেশসমূহে শিক্ষার সমতা আনয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। জিপিই বিশ্বের ৫২টি উন্নয়নশীল দেশসমূহে শিক্ষা উন্নয়নে কৌশল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রায় ৩.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ দেন এবং তা অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

উপসংহার

বিশ্বব্যাপী ২৫টি উন্নয়নশীল দেশে উভয় ছেলেদের এবং মেয়ে শিশুদের জন্য সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন ও জাতিসংঘের নারী শিক্ষা চালুকরণ (UNGEI) মাধ্যমে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে নারী-পুরুষের সমতা অর্জন করা। এইসব লক্ষ্যমাত্রা পূরণের লক্ষ্যে শিক্ষা উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচী বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আরো অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে চলেছে। এসব সংস্থা দেশগুলোর সরকার এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও বেসরকারী সংস্থা (NGO) সাথে অংশীদারত্বমূলক সমঝোতার ভিত্তিতে শিক্ষা উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। এই ক্ষেত্রে বহুপক্ষীয় সাহায্য অর্থাৎ বৈদেশিক সাহায্যে কম আয়ভূক্ত দেশসমূহকে প্রদানের মাধ্যমে মধ্যম আয়ের দেশে পৌছাতে শিক্ষা উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচীতে শর্তযুক্ত বা শর্তহীন ঋণ প্রদান বা অনুদান বা কারিগরি সাহায্য প্রদান করে সহায়তা প্রদান করেছে। উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্য হিসাবে উন্নত একক দেশ এবং জাতিসংঘের অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও অন্যান্য সংস্থাসহ এনজিদের গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়ে পরিণত হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৯

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কত সালে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা অনুমান করে ODA ৪১.৭ শতাংশ শর্তহীন হয়?
ক. ২০০০ খ্রীঃ
খ. ২০০২ খ্রীঃ
গ. ২০০৪ খ্রীঃ
ঘ. ২০০৬ খ্রীঃ

২. ১৯৮০ দশকে অস্ট্রেলিয়া কত পমিাণ অর্থ বৈদেশিক সাহায্য (ODA) দিয়ে শুরু করেন?
ক. ৮৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
খ. ৮৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
গ. ৮৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
ঘ. ৮৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

৩. বিশ্ব অংশীদারিত্ব ব্যবস্থা সংগঠন হিসাবে কত সালে "সহস্রাব্দ ঘোষণা" গ্রহণ করা হয়?
ক. ১৯৯৫ খ্রীঃ
খ. ২০০০ খ্রীঃ
গ. ২০০৫ খ্রীঃ
ঘ. ২০১০ খ্রীঃ

৪. জিপিই (এচউ) বিশ্বের ৫২টি দেশে শিক্ষা উন্নয়নে কত মার্কিন ডলার অর্থ বরাদ্দ দিয়েছিল?
ক. ২.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
খ. ৩.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
গ. ৩.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
ঘ. ৪.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার

উত্তরমালা: ১. গ, ২. খ, ৩. খ, ৪. গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শর্তযুক্ত সাহায্য বলতে কী বোঝায়?
২. বহুপাক্ষিক সাহায্য কী?
৩. অফিসিয়াল উন্নয়ন সহায়তা (ODA) বলতে কী বোঝায়?
৪. জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার নামসমূহ উল্লেখ করুন।
৫. বহুপাক্ষিক সংস্থা হিসাবে অস্ট্রেলিয়ার সাহায্যের অবদান উল্লেখ করুন।
৬. "সহস্রাব্দ ঘোষণায়" শিক্ষা উন্নয়নে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বহুপাক্ষিক সাহায্য এক ধরণের বৈদেশিক সাহায্য তা ব্যাখ্যা করুন।

২. বহুপাক্ষিক সাহায্য সংস্থাসমূহ অর্থ বরাদ্দের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।

৩. বিশ্বব্যাপী শিক্ষা উন্নয়নে বহুপাক্ষিক সংস্থার বৈদেশিক সাহায্য কীভাবে অংশীদারি হিসাবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করুন।

৪. শিক্ষা উন্নয়নে ইউনিসেফ এর অবদান সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

৫. বর্তমান বিশ্বে শিক্ষা উন্নয়নে শর্তযুক্ত ও বহুপাক্ষিক সাহায্য কতটুকু অবদান রাখছে সে সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

৬. শিক্ষা উন্নয়নে বহুপাক্ষিক দাতাদেশ এবং অংশীদারিত্বে কতটুকু কার্যকর তা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৫.১০: শিক্ষা এবং উন্নয়নে ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, ইউএনডিপি, বিশ্ব ব্যাংক, সেভ দি চিলড্রেন ও ব্র্যাক সংস্থার ভূমিকা

Role of the UNICEF, UNESCO, UNDP, WB, Save the Children, BRAC Regarding Education and Development

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিক্ষা এবং উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী ইউনিসেফের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- শিক্ষা উন্নয়নে ইউনেস্কোর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিক্ষা উন্নয়নে ইউএনডিপির ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।
- শিক্ষা এবং উন্নয়নে ঋণদান ও সহায়তার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সেভ দি চিলড্রেন শিক্ষা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কী কী ভূমিকা রাখছে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্র্যাক বেসরকারী সংস্থা হিসাবে শিক্ষা উন্নয়নে কী ভূমিকা রাখে তা চিহ্নিত করতে পারবেন।

ভূমিকা

শিক্ষা ও উন্নয়ন অন্যতম প্রভাবক হলো বিশ্বায়ন। এ বিশ্বায়নের বিভিন্ন দেশে শিশুদের পড়া, লেখা ও গাণিতিক ধারণা পাকাপোক্ত করার জন্য মৌলিক শিক্ষা তথা প্রাথমিক শিক্ষা শক্তিশালী করা প্রয়োজন। সাথে সাথে মৌলিক শিক্ষায় শিশুদের সংলাপ ক্ষমতা, উপলব্ধি সামর্থ, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক, সামাজিক জ্ঞান এবং যোগ্যতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হয়। আবার প্রতিটি দেশে বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে "জীবনব্যাপী শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় পূর্নগঠন গুরুত্ব আরোপ করতে হয়। শিক্ষা উন্নয়নে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা বিশেষত ইউনিসেফ, ইউনেস্কো ও ইউএনডিপি, বহুপাক্ষিক সাহায্যকারী সংস্থা বিশ্বব্যাংক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা "সেভ দি চিলড্রেন" এবং এনজিও ব্র্যাক বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার বিভিন্ন দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। এক্ষেত্রে এসব সংস্থা শিক্ষা উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা (অনুদান বা ঋণ) প্রদানে নানা ধরণের শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। নিচে এসব সংস্থার সাম্প্রতিক শিক্ষা এবং উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচীতে এদের ভূমিকা বর্ণনা করা হলো।

১. শিক্ষা এবং উন্নয়নে ইউনিসেফের ভূমিকা

ইউনিসেফ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শিশুদের জন্য একটি ত্রান সংগঠন হিসেবে ১৯৪৬ সালে তার মিশন শুরু হয়। ইউনিসেফ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিশুদের যাদের জীবন ঝুঁকিতে ছিল তাদের সাহায্য প্রসারিত করে। ইউনিসেফের বিশ্বব্যাপী কার্যক্রমের ১৫৭টি দেশে পরিচালিত হচ্ছে। ২০০০ সালে সহস্রাব্দ ঘোষণা বাস্তবায়নে জাতিসংঘ যুক্তরাষ্ট্রের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করে। এর মধ্যে ৪৮টি নির্দেশক এর লক্ষ্য অগ্রগতির জন্য ইউনিসেফ প্রধানত ১৩টি ধারার দায়িত্ব পালন করে আসছে। ইউনিসেফের শিক্ষা উন্নয়নে বিশ্বব্যাপী কর্মসূচীর প্রদান দিকসমূহ হচ্ছে-

ক. ইউনিসেফ এর অগ্রাধিকার উন্নয়ন অপরিহার্য সামনে রেখে পাঁচটি প্রধান কৌশলগত এলাকা নিয়ে কাজ করে।

প্রাথমটি: মিলেনিয়াম সামিট ঘোষণাপত্র বাস্তবায়নে এবং লক্ষ্য অর্জনে দিকে বিশ্বের কাজ সমর্থন করে, শিশুর জীবন শুভ সূচনা শুরু করানো।
দ্বিতীয়টি: ইউনিসেফ দারিদ্র হ্রাস নিশ্চিত করতে কার্যকরভাবে অবদান রাখে যা পক্ষ সমর্থন (Advocacy) এবং অংশীদারিত্বের মাধ্যমে শিশুদের বেচে থাকা, উন্নয়ন ও সুরক্ষার চালিয়ে যাওয়ার জন্য বিনিয়োগে সহায়তা করা।
তৃতীয়ত: তরুণ ছেলে-মেয়েরা বেঁচে থাকা এবং একটি সুস্থ, উৎপাদনশীল ভবিষ্যতের জন্য ইউনিসেফ অত্যাবশ্যক স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি জাতীয় এবং কমিউনিটিভিত্তিক শিক্ষা হস্তাক্ষেপের প্রোগ্রামে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান।
চুতর্থ: শিশুদের বিদ্যালয়ে আনা যাতে সকল শিশু বিশেষত মেয়ে শিশুদের মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান করা। নানা কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মেয়েরা শিক্ষায় পিছিয়ে রয়েছে। এক্ষেত্রে যেসব লক্ষ্য অর্জন করতে হবে সেগুলো হলো-

- সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে মেয়েদের মূল্য ও ভূমিকা তুলে ধরা।
- মৌলিক শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়ন সাধন।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়েদের শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।

পঞ্চম: শিশুর জন্য জরুরি পরিস্থিতিতে নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টিতে জীবন রক্ষাকারী উপাদানসমূহ যেমন– পরিস্কার পানি এবং মৌলিক চিকিৎসা সরবরাহ করা। এই ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর সাথে ইউনিসেফ যৌথভাবে স্থানীয় প্রকল্প উন্নয়ন যেমন মৌলিক চাহিদা পানি এবং সেনিটেশন, যাহা স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য উন্নয়ন এবং শিক্ষা চালুকরণে সাহায্য করে।

খ. মৌলিক শিক্ষা এবং লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠা: এমডিজি- ২ এবং এমডিজি- ৩ এ লক্ষ্য অর্জনে জাতিসংঘ সংস্থা, দাতাদেশ ও বিভিন্ন দেশের সাথে ইউনিসেফ সহযোগীরূপে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও লিঙ্গ সমাতয়নে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধাসহ তহবিল উন্নতীকরণে ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া নারী বৈষম্য দূরীকরণ সম্মেলন (১৯৭৯) এবং শিশু অধিকার সনদ (১৯৮৯)-এর মৌলিক লক্ষ্য অর্জনের নিরিখে ইউনিসেফ তার শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই স্তরে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর সন্তানদের শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা, নারী শিক্ষার মধ্যে শিশু বিবাহরোধ, অপরিকল্পিত গর্ভধারণ রোধ লিঙ্গ ফাঁক কমানো এবং মৌলিক স্কুল সম্পন্ন করণসহ স্বাস্থ্য শিক্ষা অন্তর্ভূক্ত করে মানসম্মত শেখার জন্য একটি শিখন বান্ধন পরিবেশ তৈরি করতে ইউনিসেফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়াও ইউনিসেফ এইচ আই ডি/এইডস এবং শিশু যা এমডিজি- ৬ লক্ষ্য অর্জনে অফাড়পধপু, সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রতিরোধ, এতিম শিশুদের সাহায্য ইত্যাদি কার্যক্রম স্থানীয় জনগন ও কিশোর-কিশোরীদের জড়িত থাকার মাধ্যমে অংশদারীত্বের ভিত্তিতে সহায়তা প্রদান করে থাকে। শিশুদের সুরক্ষায় মিলেনিয়াম সামিট ঘোষণা এর অনুচ্ছেদ ৬ এর সমর্থনে ক্ষতিগ্রস্থদের রক্ষা করার জন্য প্রতিরোধমূলক পরিবেশ গড়ে তোলা এবং শিশু সহিংসতা, শোষণ, নির্যাতন, বৈষম্যমূলক আচরণ ও শিশুদের জন্য জরুরী সাড়ার ক্ষেত্রে ইউনিসেফ তাদের বিভিন্ন কর্মসূচীর প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

গ. নীতি বিশ্লেষণ, অ্যাডভোকেসি ও শিশু অধিকারের জন্য অংশীদারী: এই ক্ষেত্রে ইউনিসেফ বিশ্ব উন্নয়ন অংশীদারিত্ব স্থাপন এবং শিশু অধিকার যাতে বিকেশিত হতে পারে সেক্ষেত্রে জাতীয় শক্তিশালীকরণ ও স্থানীয় নীতিগুলো টিকে থাকার অগ্রণী ভুমিকা পালন করে থাকে। শিশু দারিদ্র হ্রাসে এই অধিকার পূরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এমডিজি- ১ পূর্ণ করার জন্য ইউনিসেফ টেকসই জাতীয় ও বৈশ্বিক বিনিয়োগে উৎসাহিত করে থাকে যা শিশুদের শিশু কল্যাণ ও জরুরী শিক্ষা সেবা নিশ্চিত করে। বিশ্বের সরকার, আঞ্চলিক সংস্থা, বেসরকারী সংস্থা এবং নাগরিক

সমাজসহ অংশীদারিত্ব এর ব্যাপক পরিধির সঙ্গে কাজ করতে ইউনিসেফ সূত্র প্রদান করে। তাছাড়া সেক্টর ব্যাপী পন্থা উন্নয়নে অংশগ্রহণ, দারিদ্র বিমোচন কৌশল পরিকল্পনা (PRSP) ও বাজেট এর ক্ষেত্রে ইউনিসেফ ভূমিকা পালন করে থাকে। ইউনিসেফ জ্ঞান ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চাহিদা, পর্যবেক্ষণ নিয়ে গবেষণা এবং শিক্ষার রেকর্ড সংরক্ষণে নেতৃত্বদানকারী সংস্থা হিসেবে স্বীকৃত। ইউনিসেফ ১৯৯০ সালে মাঝামাঝি বহুমূখী নির্দেশক ক্লাস্টার সার্ভে (MICS) পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এটি সহজলভ্য এবং কার্যকর হাতিয়ার এমআইসিএস (MICS) মানবাধিকার পরিপূর্ণতা এবং এমডিজি লক্ষ্যের অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য তথ্য একটি প্রধান উৎস। ইউনিসেফ এটি ব্যবহার উৎসাহিত করে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি এবং শিক্ষার উন্নয়নে নির্দেশক সমূহ বাস্তবায়নে সরকারদেরকে সাহায্য করে এবং সংগৃহীত তথ্য উপস্থাপন করে। ইউনিসেফ আরো কার্যকরভাবে জমাকৃত তথ্য টেবিল, গ্রাফ ও ম্যাপের মাধ্যমে সফটওয়ার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিনিয়োগ করেছে। ইউনিসেফ তাদের নিজস্ব মতামত বিষয় সমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে শিশু ও তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে থাকে। এই চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা শিশু অধিকারের জন্য সমর্থন প্রদান তাদের ধারণা একে অপরের সাথে বিনিময় করার জন্য ওয়েব সাইট তৈরিতে সহায়তা করার কার্যক্রম রয়েছে। তাছাড়া শিক্ষা উন্নয়নে ইউনিসেফ উন্নয়ন অংশীদারিত্ব দেশসমূহ, আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় এনজিও, বে-সরকারী সেক্টর এবং নাগরিক সমাজ সংস্থাসমূহের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে থাকে। কাজের তীব্রতা বৃদ্ধিতে দাতাদেশসমূহ যেমন– অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, জার্মানি, জাপান, নেদারল্যান্ড, সুইডেন, যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নসহ বিভিন্ন জাতীয় কমিটির সাথে সহযোগীরূপে ও সমন্বয় করে থাকে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশে শিক্ষা কর্মসূচীতে ইউনিসেফের ভূমিকা–

- এমডিজি ২ ও ৩ বাস্তবায়নে সহযোগীরূপে কাজ করে।
- সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অগ্রগতিতে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচীতে পিইডিপি- ২ আর্থিক সহযোগিতা প্রদান।
- জাতীয় শিক্ষা নীতিতে মেয়ে শিশুদের শিক্ষা ও ক্ষমতায়নে অংশগ্রহণ।
- সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বে নিবিড় ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- বহুমূখী দৃষ্টিভঙ্গি ও আন্তঃখাত কৌশলের বিকাশ সাধন।
- মেয়েদের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নে শিশু বিবাহরোধে গণমাধ্যম এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রমে সহায়তা।
- শিক্ষাক্রমে জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষাকে অন্তর্ভূক্তকরণ।
- শিশু বিকাশে শিশু অধিকার, শিশু নিরাপত্তা, শিশু স্বাস্থ্য প্রভৃতিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রমসহ সহায়তা প্রদান।
- যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তিতে প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে শিশু অধিকার, নারী সমতা, ক্ষমতায়ন, আন্তর্জাতিক শিশু দিবস উপলক্ষে ডকুমেন্টারী ফ্লিম ও কার্টুন তৈরীতে সহায়তা প্রদান।

২. শিক্ষা এবং উন্নয়নে ইউনেস্কোর (UNESCO) ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালে ১৬ নভেম্বর বিশ্বের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর পুরুষ ও মহিলা উভয়ের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন। জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO) জাতিসংঘ উন্নয়ন গ্রুপের সদস্য হিসাবে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে কাজ করছে। ইউনেস্কোর সদস্য দেশের সংখ্যা ১৯৫টি। ইউনেস্কো মূলতঃ ৫টি প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সামাজিক ও মানবিক সমাজ, সাংস্কৃতিক এবং তথ্য ও যোগাযোগ উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে চলছে। শিক্ষা উন্নয়নে ইউনেস্কোর ভূমিকা বর্ণনা করা হলো–

ক. **বিশ্ব অংশীদারীত্ব দলঃ** ইউনেস্কো ১৯৫টি সদস্য রাষ্ট্র, ১১টি সহযোগী সদস্য দেশ, ৩/৪টি দেশের ক্লাস্টার অফিস এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক অফিসসমূহের মধ্যে সমন্বয় করে বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব দল গঠনে ভূমিকা

রাখে। বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সদস্যভূক্ত বা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, এমডিজি (MDGs) লক্ষ্য পূরণ ও মানবাধিকার শিক্ষা উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প যেমন– স্বাক্ষরতা, কারিগরি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান প্রোগ্রাম ইত্যাদি প্রণয়ন ও আর্থিক যোগান ইউনেস্কোর সমন্বয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে।

ইউনেস্কো আঞ্চলিক সম্মেলন সভা আয়োজনের মাধ্যমে সদস্য দেশসমূহ শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও শিক্ষা উন্নয়নে কৌশলগত দিক উন্নয়নে সহায়তা দিয়ে থাকে। জাতীয় নীতি, জাতীয় প্রশিক্ষণের সুযোগ সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণ, সহায়ক সেবা, গণমাধ্যম, শিক্ষা পদ্ধতি ও কৌশলের উন্নয়নে সমন্বয় করে থাকে।

ইউনেস্কো বয়স্ক শিক্ষা উন্নয়নে সভা ও সম্মেলন আয়োজন করে থাকে। সদস্যদেশসমূহে বয়স্ক উন্নত করার জন্য এর পদ্ধতি ও কৌশলসহ গণ মাধ্যমকে সবোচ্চ সহায়তা প্রদান করা। তাছাড়া বয়স্ক স্বাক্ষরতা পদ্ধতির জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে ধারাবাহিকভাবে উন্নয়ন এবং বিশ্ব সাক্ষরতা প্রোগ্রাম ও বয়স্ক সাক্ষরতা গবেষণা উন্নতিকরণের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে আসছে।

ইউনেস্কো সারা বিশ্বে শিক্ষার সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এবং অর্থ যোগানে অংশীদারিত্বের সাথে সমন্বয় ও সহযোগীরূপে কাজ করে আসছে। শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও ইস্যু বিষয়ে শিখন সামগ্রী, শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রস্তুত ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। ইউনেস্কো শিক্ষা উন্নয়নে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রোগ্রামে পরিচালনাসহ অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এতে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের পাশাপাশি সংখ্যাগত মানের উন্নয়ন হতে থাকে যা পরবর্তীতে ধরে রাখার (Sustainable) ক্ষেত্রে ইউনেস্কো অন্যতম ভূমিকা পালন করে থাকে।

খ. **বিশ্ব শিক্ষা প্রথম প্রবর্থন (Global Education First Initiative):** ইউনেস্কো জিইএফআই গঠন করেন এবং এর মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসে শিক্ষা একমাত্র কার্যকরী পথের নির্দেশক হিসাবে সদস্য দেশসমূহের উপযুক্ত দায়িত্বশীল নাগরিকে উন্নতিকরণ করা। ইউনেস্কো সবার জন্য শিক্ষা ও কারিগরি, বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিস্তার জিইএফআই (GEFI)-কে সহায়তার জন্য সদস্য দেশভূক্ত ও বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা এবং তহবিল গঠনে অন্যতম ভূমিকা পালন করে আসছে।

গ. **মিলেমিশে বসবাস করতে শেখা (Learning to Live Together):** শিক্ষার অবশ্যই অর্থ হবে এমন শিশু ও বয়স্ক ক্ষমতায়নে শিখনে সক্রিয় অংশগ্রহণ সমাজে মানুষে মানুষে উপলব্ধি বৃদ্ধিতে স্থানান্তর করতে পারে। এই শিখন উপলব্ধি সমাজে দ্বন্দ্ব সংঘাত নিরসনে, ছিন্নমূল মানুষ, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের প্রতি শ্রদ্ধশীল মনোভাব গঠন, সমঝোতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্বায়নে শিখন-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা। ১৯৯০ সালে ইউনেস্কো শিক্ষা বৈষম্যমূলক বিরুদ্ধে সভা সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব জাতিগত বা উপজাতি দল ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী সকল সদস্যদের শিক্ষায় সকল সুযোগ সুবিধা সমতায়ন নিশ্চিতকরণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ. **শিশুদের শিক্ষা চাহিদা প্রোগ্রাম:** ইউনেস্কো শিশুদের শিক্ষার জন্য চাহিদা প্রোগ্রাম ১৯৯২ সালে প্রণীত করেন। এতে ভবিষ্যত ক্ষতিগ্রস্থ শিশুদের শিক্ষা উন্নয়নে এই প্রোগ্রাম শুরু করেন। এই প্রোগ্রামটি ৯৭টি দেশে ৪০০ প্রকল্পের সহায়তা প্রদানে ৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বেসরকারী তহবিল সংগ্রহে বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ভূমিকা রাখছে।

ঙ. **মানবাধিকার শিক্ষা:** শিক্ষা মানে শান্তি, বৈষম্যহীন নয়, মনোভাবে বিচার করে, সহিসংতা নয়, জঙ্গীবাদ নয়, সন্ত্রাস নয়, একে অপরের সাথে সম্মান জাগ্রত করে, গুণগত শিক্ষা যা মানবাধিকার শিক্ষা অন্তর্ভক্ত করে। এতে ইউনেস্কো মানবাধিকার সহযোগীরূপে কাজ করে এবং উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

চ. **স্বাস্থ্য শিক্ষা:** ইউনেস্কো "স্বাস্থ্যের জন্য শিক্ষা" কর্মসূচি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে যা মানসিক স্বাস্থ্য ও শিশু বিকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিক্ষা কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে আসছে।

ছ. **টেকসই ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা:** একুশ শতকে শিক্ষার জন্য ইউনেস্কো বিশ্বাস করেন যে গুণগত শিক্ষাই জীবনব্যাপী মানব অধিকার নিশ্চিত করে। তাই ২০৩০ সালে বিশ্ব শিক্ষা লক্ষ্য অর্জনে টেকসই উন্নয়নে Framwork for Action (FFA) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ভূমিকা পালন করে আসছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৪ এ বর্ণিত ধারায় একীভূত শিক্ষা ও সবার জন্য গুণগত শিক্ষা সমতা আনায়নে নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিখনে সকল সুযোগ-সুবিধা উন্নতীকরণে সহায়তা করার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

২০০০ সালে বিশ্ব শিক্ষা ফোরামে Dakar Framwork for Action (DFA) এ সবার জন্য শিক্ষার ছয়টি লক্ষ্য অর্জনে সরকার, উন্নয়ন সংস্থা, নাগরিক সমাজ এবং বে-সরকারী সেক্টরের সাথে ইউনেস্কো একত্রে কাজ করে এবং সহায়তা দিয়ে থাকে। তাছাড়া ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ, ইউনিসেফ ও বিশ্বব্যাংকের সাথে ইউনেস্কো নীতিগত দিক মত বিনিময়, পরীবিক্ষণ, এ্যাডভোকেসি, তহবিল সংগ্রহ এবং টেকসই উন্নয়নে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের ভূমিকা পালন করে আসছে।

৩. শিক্ষা উন্নয়নে ইউএনডিপি (UNDP) ভূমিকা

১৯৬৫ সালে ২২ নভেম্বর ইউএনডিপি জাতিসংঘের বিশ্ব উন্নয়নে হিসাবে মিশন শুরু করেন। ইউএনডিপি ১৭৭টি দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ইউএনডিপি সদস্য দেশসমূহে জনগোষ্ঠীর উন্নত জীবন তৈরিতে তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং সম্পদের পরিবর্তন এর সমর্থক হিসাবে ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া উন্নয়নশীল দেশসমূহ উন্নত করার জন্য বিশেষজ্ঞ সূলভ পরামর্শ, প্রশিক্ষণ এবং অনুদান যোগানে সমর্থন করে থাকে।

ইউএনডিপি উন্নয়নশীল দেশের দারিদ্র্য হ্রাস, এইচআইডি/এইডস, সরকার ব্যবস্থার মান উন্নয়ন, শক্তি এবং পরিবেশ, সামাজিক উন্নয়ন এবং সঙ্কটকাল নিরোধ উদ্ধারে বিশ্ব উন্নয়নে উৎসাহিত করা এবং এমডিজি (গউএ) লক্ষ্য পূরণ সম্পন্ন করার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এছাড়াও ইউএনডিপি মানব অধিকার রক্ষা এবং মহিলাদের ক্ষমতায়নে বিভিন্ন প্রোগ্রাম বা কর্মসূচীতে উৎসাহিত করে থাকে।

ইউএনডিপি সদস্যভূক্ত দেশের চাঁদায় স্বেচ্ছামূলক তহবিল গঠনের মূল ভূমিকা পালন করে থাকে। এতে ১৭৭ দেশের উন্নয়নে বাধা দূর এবং স্থানীয় সামর্থ্য উন্নত করার জন্য স্থানীয় সরকারে ও স্থানীয় কমিটিসমূহের সাথে ইউএনডিপি সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। ইউএনডিপি এমডিজির লক্ষ্য, বিশ্ব এবং জাতীয় উন্নয়নে চ্যালেঞ্জ সমূহ গুরুত্বের ভিত্তিতে অর্জনের জন্য সমন্বয় হিসাবে ভূমিকা পালন করে থাকে। ইউএনডিপি প্রাথমিক দৃষ্টিতে সংকটকাল নিরোধ এবং উদ্ধার, সরকার ব্যবস্থার মান উন্নয়ন বা গণতান্ত্রিক সরকার, দারিদ্র নিরসন, পরিবেশ ও শক্তি ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে এইচআইভি/এইডস এই পাঁচটি উন্নয়নে চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যদি শিক্ষা উন্নয়নে সরাসরি তেমন ভুমিকা পালন করে না। তবে এই পাঁচটি ক্ষেত্রে শিক্ষা উন্নয়নে সম্পর্ক রয়েছে। এজন্য ইউনিসেফ ও ইউনেস্কো শিক্ষা উন্নয়নে এবং শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্পের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে ইউএনডিপির ভূমিকা পালনের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

নারী শিক্ষা ও নারী ক্ষমতায়নে নারী উন্নয়নে সরকার, এনজিও এবং দাতা দেশের মধ্যে ইউএনডিপি বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়নে সহায়তার জন্য সমন্বয়ের ভূমিকা পালন করে থাকে। ইউএনডিপি ২০১৪-২০১৭ সালের মধ্যে জেন্ডার সমতায় কৌশলগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ইউএনএফপিএ এবং জাতিসংঘের মহিলা সংস্থার সাথে একত্রে নেতৃত্ব দিয়ে থাকে।

২০১৬-২০২১ সালের মধ্যে এইচআইভি/এইডস মোকাবেলা এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা শিক্ষা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করে থাকে। তবে এইচআইভি এবং নীতি/আইন বিশ্ব কমিশনের সাথে ইউএনডিপি নেতৃত্বকারী সংস্থা হিসাবে তহবিল সংগ্রহ ও বিতরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তথ্য ও প্রযুক্তি ও টেকসই উন্নয়নে ইউএনডিপি তহবিল গঠনে বিশ্ব অংশীদারিত্ব হিসাবে ভূমিকা পালন করে আসছে। তাছাড়া ভবিষ্যৎ ভালো অবস্থার জন্য ইউএনডিপি জাপান অংশীদারিত্ব হিসাবে কাজ করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায় বিশ্বব্যাপী মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন, জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা অর্জনে স্বাস্থ্য উন্নত, সহিসংসতা বন্ধ, বৈষম্যহীন শিক্ষা প্রতিরোধ, জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাস বন্ধের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম বা বিভিন্ন প্রকল্পে ইউএনডিপি অর্থ ও কারিগরি সহায়তা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৪. শিক্ষা উন্নয়নে বিশ্ব ব্যাংকের ভূমিকা (W.B)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিশ্ব অর্থনীতিতে মারাত্মক সংকটে পতিত হয়। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের লক্ষ্যে ব্রেটন উডস সম্মেলন আয়োজনে বিশ্বের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও অর্থবিদগণ মিলিত হন। উক্ত সম্মেলনে বিশ্ব অর্থনীতি সংকট উত্তোরণে ঋণ ও উন্নয়ন সহযোগিতা প্রদানের জন্য International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যা পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংকে পরিণত হয়। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে অফিসিয়েল ভাবে বিশ্বব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪৬ সালের জুন মাসে কার্যক্রম শুরু করে।

পরবর্তীতে বিশ্ব ব্যাংক ঋণ প্রদান কার্যক্রমকে সহজতর এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের বেসরকারি খাতে ঋণ প্রদান কর্মসূচি প্রবর্তনের জন্য নিম্নোক্ত সহযোগী সংগঠনসমূহ স্থাপন করে।

১. আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা International Development Association (IDA)
২. আন্তর্জাতিক পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা International Finance Corporation (IFC)
৩. বহুপক্ষীয় বিনিয়োগ নিশ্চিত সংস্থা (Multilateral Investment Guarantee Agency)

শিক্ষা উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার বা আইডিএ অন্যতম ভূমিকা রাখে। ১৯৬০ সালে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশসমূহে সকলকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করার লক্ষ্যে আইডএ প্রতিষ্ঠিত করে। আইডিএ বিশ্বের অনুন্নত দেশ যাদের মাথাপিছু আয় ৮০০ মার্কিন ডলারের উপরে তাদেরকে ৭% হার সুদে ১৫ থেকে ২০ বছরের জন্য এবং যাদের মাথাপিছু আয় ৮০০ মার্কিন ডলারের নীচে তাদেরকে ০.৭৫% সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে ৩৫ থেকে ৪০ বছরের জন্য সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করে।

বিশ্ব ব্যাংক উন্নয়নশীল ও কম আয়ভূক্ত দেশসমূহে (LICs) শিক্ষা লক্ষ্যের অর্জনে আর্থিক সহায়তা একটি চলমান প্রক্রিয়া। তবে গত দশকে শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে অর্থায়েনর কিছুটা পরিবর্তন আনয়ন করেছে। এ লক্ষ্যে শিক্ষা খাত বোর্ড গঠন করে পরবর্তী দশকে কৌশলগত পরিকল্পনার জন্য আইডিএ পূর্নগঠন, বহুমূখী দাতা কর্তৃক তহবিল সংগ্রহ এবং বহিস্থঃ অংশীদারীর ভিত্তিতে শিক্ষার চাহিদা নিরূপণ ও অর্থায়নের জন্য বিশ্ব ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছে।

আন্তর্জাতিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন বিশ্ব ব্যাংক কেন্দ্রস্থিত ভুমিকা পালন করে থাকে। উন্নয়নশীল, নিম্ন আয়ভূক্ত ও মধ্যম আয়ভূক্ত দেশসমূহে শিক্ষা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বহুমূখী দাতাদেশ ও ট্রাস্টি দাতা দেশের সাথে যোগাযোগ করে তহবিল সংগ্রহ এবং বিশ্ব শিক্ষানীতি নির্দিষ্ট আকার দেওয়ার জন্য সাহায্য হিসাবে দৃঢ়ভাবে লেনদেন প্রবর্তন অনুগঠক প্রক্রিয়া সংক্রান্ত (Fast Truck Initatives Catalytic) তহবিল মঞ্জুরের ভূমিকা পালন করে থাকে।

কম আয়ভূক্ত দেশসমূহে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে আইডএ এবং মধ্যম আয়ভূক্ত ও দারিদ্রতম দেশ সমূহে আইবিআরডি (IBRD) এই উভয় ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের শিক্ষা খাত বোর্ড ব্যবস্থাপনায় ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে বিশ্ব ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আবার বিশ্বে সবার জন্য শিক্ষা ও এমডিজির লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা খাত উন্নয়নে বিশ্ব ব্যাংকের অন্যতম ভুমিকার প্রধান দিক হলো আইডিএ-কে সম্পূরণ যা আইডিএ ১৬ নামে অভিহিত করা হয়। এই আলোকে আইডিএ ৭৯টি নিম্ন আয়ভূক্ত দেশকে সুদমুক্ত ঋণ প্রদানে দাতা সরকার দেশের সাথে সমঝোতার ভুমিকা পালন করে থাকে। (IDA16- Replenishment 2010)

বিশ্বব্যাংক ২০১০ সালের আইডিএ সম্পূরণ আলোকে মানব উন্নয়নে নেটওয়ার্কে শিক্ষা খাত ২০২০ পর্যন্ত শিক্ষার কৌশলগত দিকসমূহ প্রস্তুত করেন (The World Bank's Education Sector Strategy 2020)। এই ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক শিক্ষার স্টেকহোল্ডার, দাতা দেশ এবং আইডএ সাথে আলোচনা করে যাতে মানসম্পন্ন শিক্ষা উন্নীতকরণ এবং মৌলিক শিক্ষা ববস্থাপনার জন্য শিক্ষা খাতের বিভিন্ন কৌশল বাস্তবায়নে ঋণ সহায়তান ভূমিকা পালন করে থাকে।

বিশ্বব্যাংক এডুকেশন সেক্টর বোর্ডের মাধ্যমে সকল শিক্ষার উপ-খাতে নিম্ন ও মধ্যম আয়ভূক্ত দেশসমূহে (আইডিএ ও আইবিআরডি) ঋণ দান কর্মসূচিতে বছরে গড়ে ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রদানে ভূমিকা পালন করে থাকে।

বিশ্বব্যাংক শিক্ষা উন্নয়নে বার্ষিক ঋণ দান কর্মসূচিতে সবচেয়ে বেশী ঋণ সহায়তা পেয়ে থাকেন যথাক্রমে বাংলাদেশ (৬৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), পাকিস্তান (৮৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ও ভারত (১.৬৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। এতে বাংলাদেশে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষা উন্নয়নের বিভিন্ন শিক্ষার উপখাত উন্নতিকরণে ঋণ সহায়তায় বিশ্বব্যাংক জোরালো ভূমিকা পালন করে থাকে।

৫. সেভ দি চিলড্রেন (Save the Children)-এর শিক্ষা উন্নয়নের ভূমিকা

১৯৩২ সালে যুক্তরাষ্ট্র শিশুদের অধিকার ও তাদের জীবন ধারায় শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে "সেভ দি চিলড্রেন" নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গঠিত হয়। বর্তমানে বিশ্বের ১২০টি উন্নয়নশীল দেশসমূহ যুক্তরাষ্ট্রের সব অঞ্চলে সংস্থাটি শিশুদের আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে শিশু ও পরিবারকে উন্নয়নে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

শিশু অধিকারের ক্ষেত্রসমূহ হলো– শিশু রক্ষা, শিশু শিক্ষা এবং শিশু উন্নয়ন, জরুরী সাড়া, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং জীবন যাত্রার ধারা উন্নয়ন এসব অর্জনে এই সংস্থাটি যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নয়নশীল দেশসমূহে অর্থ সাহায্য ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়া শিশুদের পারিবারিক উন্নয়নে ক্ষেত্রে শৈশবকালীন শিশুদের উন্নয়ন, সাক্ষরতা, শারীরিক কর্মকান্ডে, পুষ্টি ও জরুরী সাড়া প্রদানে যাবতীয় এ্যাডভোকেসি সহ কমিউনিটি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। এই সংস্থাটি আন্তর্জাতিক শিশু রক্ষা সংঘের অন্যতম সদস্য হিসাবে বিশ্বের ১১৫টি দেশে শিশু রক্ষা ও জরুরী প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের অন্যতম ভূমিকা পালন করে থাকে।

শিক্ষা এবং উন্নয়নে সেভ দি চিলড্রেন উন্নয়নশীল দেশসহ যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন অঞ্চলে শিশুদের প্রাথমিক শৈশবকালীন বিকাশ শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক সাক্ষরতা ও বালিকাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচী, নীতি ও পদ্ধতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানে প্রধান ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও সংস্থাটি স্বাস্থ্য ও এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে অনুরূপ শিক্ষা কর্মসূচী প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন ও সহায়তা করে থাকে।

বিশ্বব্যাপী এমডিজি ফ্রেমওয়ার্কে ২য় লক্ষ্য অর্জনে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং ৩য় লক্ষ্য শিক্ষার সকল স্তরে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে এই সংস্থাটি সরকার ও কমিউনিটি সাথে অংশীদারিত্বের ভূমিকা পালন করে। এই সংস্থাটি বিভিন্ন শিক্ষা দিবস ও শিশু অধিকার সংক্রান্ত সভা, সেমিনার, সচেতনতা বৃদ্ধিতে আন্তর্জাতিক সংস্থা, সরকার ও কমিউনিটির সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের ভূমিকা পালন করে।

১৯৭২ সাল থেকে এই সংস্থাটি বাংলাদেশে প্রাথমিক শৈশবকালীন শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, নবজাতকের স্বাস্থ্য, কিশোরীদের প্রজনন ও যৌন স্বাস্থ্যসহ শিশুদের পিতামাতা ও সমাজের সদস্যদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

বাংলাদেশ ছাড়াও বিশ্বের যুদ্ধবিধ্বস্থ সংঘাতময় দেশ হতদরিদ্র দেশসমূহ যেমন– জিবুতি, ইথিওপিয়া, গিনি, মালি, সুদান, উগান্ডা, হাইতি, আফগানিস্তান, ভুটান, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, জর্ডান, লেবানন ও তাজাকিস্তান প্রভৃতি অনুরূপ শিক্ষা উন্নয়নে কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আর্থিক কারিগরি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সেভ দি চিলড্রেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পরিশেষে এই সংস্থাটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেমন যুক্তরাজ্যের অনুরূপ সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে শিক্ষা উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণে পারস্পরিক সম্পর্ক গঠনে জোরালো ভূমিকা রাখে।

৬. শিক্ষা উন্নয়নে ব্র্যাকের ভূমিকা (BRAC)

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর সুনামগঞ্জ জেলায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা পূনর্গঠন এবং রিলিফ বিতরণের মাধ্যমে ১৯৭২ সালে স্যার ফজলে হাসান আবেদ Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee কাজ শুরু করেন। পরবর্তী ১৯৭৩ সালে অসহায় গরীব মানুষের ক্ষমতায়ন এবং ভূমিহীন লোক বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের লক্ষ্যে Bangladesh Rural Adancement Committee (BRAC) কাজ শুরু করে।

দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ব্র্যাক বর্তমানে অনেক ধরণের কর্মসূচীর মধ্যে তিনটি কর্মসূচী হল–

১. ব্র্যাক উন্নয়ন কর্মসূচী
২. ব্র্যাক স্বাস্থ্য কর্মসূচী
৩. ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচী

এই তিনটির মধ্য শিক্ষা উন্নয়নে ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচী গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশে ২২টি স্কুল নিয়ে শিক্ষা কর্মসূচীর যাত্রা শুরু। বর্তমানে এর পরিধি বাংলাদেশ ছাড়া আন্তর্জাতিক পরিসরে বিস্তৃত এবং শিক্ষা সংক্রান্ত অনেক নতুন নতুন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তাই নিম্নে শিক্ষা উন্নয়নে ব্র্যাকের ভূমিকা বর্ণনা করা হলো-

১. প্রাথমিক শিক্ষা: বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে বেসরকারী সংস্থা হিসাবে ব্র্যাকের ভূমিকা অন্যতম। এই সংস্থাটি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ধারায় বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুল তৈরি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। ৮-১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্য যারা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে ত্যাগ করে থাকে, ভর্তি হয়নি বিশেষ করে দরিদ্র, গ্রামাঞ্চল, সুবিধা বঞ্চিত এবং ভর্তি হওয়ার পর ঝরে পড়া এসব শিশুদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনসহ যাবতীয় সুযোগ সুবিধা প্রদানে ব্র্যাকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

আবার ১০-১৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য যারা প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হয়নি বা ভর্তি হওয়ার পর ঝরে পড়েছে। এসব শিশুদের জন্যও প্রাথমিক বিদ্যালয় যা অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

এই ধরণের প্রাথমিক স্কুল ব্র্যাক প্রাইমারী নামে অভিহিত করা হয়। তাদের শিক্ষণ-শেখানো কলা কৌশল প্রতি ২৫-৩০ জনের জন্য একটি স্কুল ও ১ জন শিক্ষিকা থাকেন। প্রস্তুতি পর্ব থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করে থাকে। এতে শিক্ষার্থীর খাবার, নমনীয় শিখন সময় এবং একাডেমিক কার্য-সম্পাদনের উপর বৃত্তি প্রদান প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধা প্রদানে ব্র্যাক স্থানীয় কমিটি ব্যক্তিবর্গ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সাথের যোগাযোগ করা ও সমন্বয় এর মাধ্যমে সহায়তা প্রদানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া ব্র্যাক ৫+ এর বয়সী শিশুদের ১ বছর মেয়াদী শিশু শ্রেণি স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা পালন করে থাকে।

বাংলাদেশের সরকার “সবার জন্য শিক্ষা” নিশ্চিতকরণ এবং এমডিজি লক্ষ্য ২ ও ৩ নং সাবর্জনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন এবং লিঙ্গ সমতা ও নারী ক্ষমতায়নে উন্নতি সাধনে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে অর্জন ও সরকারকে সহায়তা প্রদানে ব্র্যাক অন্যতম ভূমিকা রাখে।

কিশোরী উন্নয়ন কর্মসূচী: কিশোরীদের জীবন ভিত্তিক বিষয়াদি সম্পর্কে সচেতন যেমন– প্রজনন স্বাস্থ্য, আইন ও অধিকার, শিশু বিবাহরোধ এবং বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যা সমাধান ইত্যাদি বিষয়ে কিশোরীদের দক্ষ, দায়িত্ববান, নেতৃত্ব ও মানসিক বিকাশে প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থানীয়দের সহযোগীতা “কিশোরী কেন্দ্র” পরিচালনায় ব্র্যাক অন্যতম ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া তথ্য ও প্রযুক্তি সমৃদ্ধ গণ পাঠাগার পরিচালনা করে থাকে।

মাধ্যমিক শিক্ষা: শিক্ষার গুনগত মান নিশ্চিত করণে ব্র্যাক মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, শিখন সামগ্রী যেমন শিক্ষা উপকরণ, ই-বুক প্রস্তুত, তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি ব্যবস্থাকরণে সরকার ও সরকার গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের সাথে সহযোগীরূপে কাজ করে। তাছাড়া ব্র্যাকের নিজস্ব কর্মসূচীতে মাধ্যমিক পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষককে পেশাগত মান বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ও বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সচেতনতামূলক শিক্ষা কার্যক্রমে পরিচালনা ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উচ্চ শিক্ষা: শিক্ষা উন্নয়নে ব্র্যাক তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে।

আন্তর্জাতিক: শিক্ষা উন্নয়নে বাংলাদেশ ছাড়াও বিশ্বের অনেক দেশ যেমন– আফগানিস্তান, শ্রীলংকা, পাকিস্তান, তাঞ্জানিয়া, উগান্ডা, সাইথ সুদান, সিরিয়া লায়ন, হাইতি, ফিলিফাইন, নেপাল ও মায়ানমার যুদ্ধ বিধ্বস্ত, ক্ষতিগ্রস্থ শিশু ও নারী উন্নয়নে বিভিন্ন শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানে ব্র্যাক কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

উপসংহার

বাংলাদেশ সহ উন্নয়নশীল দেশ সমূহে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, মধ্যম আয়ভূক্ত দেশে উন্নতিকরণ, মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা উন্নয়ন, মান সম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা, টেকসই শিক্ষা, দারিদ্রতা হ্রাসের শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি ও তথ্য ও প্রযুক্তির শিক্ষা প্রভৃতি শিক্ষা খাত উন্নয়নে ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, ইউএনডিপি, বিশ্ব ব্যাংক এবং বেসরকারী সংস্থা সেভ দি চিলড্রেন, ব্র্যাক সহ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। এতে উন্নয়নশীল দেশসমূহ এমডিজি লক্ষ্য সমূহ বাস্তবায়নসহ মধ্যম আয়ভূক্ত দেশে উন্নতিকরণে এসব সংস্থাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১০

ক. বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বিশ্বব্যাপী কার্যক্রমে কতটি দেশে ইউনিসেফ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে?
ক. ১৪৭ টি
খ. ১৫৭ টি
গ. ১৬৭ টি
ঘ. ১৭৭ টি

২. ইউনেস্কোর সদস্য দেশের সংখ্যা কত?
ক. ১৮৫ টি
খ. ১৯০ টি
গ. ১৯৫ টি
ঘ. ২০০ টি

৩. শিক্ষা উন্নয়নে ইউনিসেফ অংশীদারিত্ব দেশসমূহের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে–
i. আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় এনজিও
ii. বে-সরকারী সংস্থা
iii. নাগরিক সমাজ সংস্থা
নীচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৪. ইউএনডিপি কত সালে কার্যক্রম শুরু করে?
ক. ১৯৫৫ খ্রীঃ
খ. ১৯৬০ খ্রীঃ
গ. ১৯৬৫ খ্রীঃ
ঘ. ১৯৭০ খ্রীঃ

৫. বিশ্বব্যাংকের সহযোগী সংগঠনসমূহ–
i. আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (IDA)
ii. আন্তর্জাতিক পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা (IFC)
iii. আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF)
নীচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৬. সেভ দি চিলড্রেন (ইউএসএ) কত সালে বাংলাদেশে এই সংস্থাটি কার্যক্রম শুরু করেন?
ক. ১৯৭২ খ্রীঃ
খ. ১৯৭৪ খ্রীঃ
গ. ১৯৭৬ খ্রীঃ
ঘ. ১৯৭৮ খ্রীঃ

৭. ব্র্যাক প্রাইমারী স্কুলে তালিকাভূক্ত করা হয় যাদের তারা হলো–
i. যারা প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হয়নি
ii. সুবিধা বঞ্চিত শিশু ও দরিদ্র শিশু
iii. ভর্তি হওয়ার পর ঝরে পড়েছে

নীচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

উত্তরমালা: ১. খ, ২. গ, ৩. খ, ৪. গ, ৫. ক, ৬. ক, ৭. গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা উন্নয়নে ইউনিসেফের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সমূহ লিখুন?
২. ইউনিসেফের অগ্রাধিকার কৌশলগত ক্ষেত্রসমূহ কি কি?
৩. বাংলাদেশ শিক্ষা কর্মসূচীতে ইউনিসেফের ভূমিকা বর্ণনা করুন।
৪. ইউনেস্কো শিক্ষা উন্নয়নে আন্তর্জাতিক প্রোগ্রাম পরিচালনার ভূমিকাটি কী?
৫. ইউনেস্কো শিক্ষা উন্নয়নে বিশ্ব অংশীদারিত্বের বিভিন্ন দিকসমূহ উল্লেখ করুন।
৬. ইউএনডিপির শিক্ষা উন্নয়নে তহবিল গঠনের ভূমিকাটি বর্ণনা করুন।
৭. বিশ্বব্যাংকের শিক্ষা খাতে ঋণ প্রদানের প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করুন।
৮. সেভ দি চিলড্রেন বে-সরকারী সংস্থা হিসাবে শিক্ষা উন্নয়নে প্রধান ভূমিকাটি লিখুন।
৯. ব্র্যাক শিক্ষা উন্নয়নে প্রাথমিক স্কুলে প্রভাব কতটুকু কার্যকর ভুমিকা রাখে তা বর্ণনা করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বিশ্বব্যাপী শিক্ষা উন্নয়নে ইউনিসেফের ভূমিকা কতটুকু কার্যকর বলে আপনি মনে করেন? স্বপক্ষে আপনার মতামত দিন।
২. ইউনেস্কো শিক্ষা উন্নয়নে যে সমস্ত ভূমিকা পালন করে থাকে তা কতটুকু কার্যকর সে সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।
৩. ইউএনডিপি শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নে ভূমিকা বর্ণনা করুন।
৪. শিক্ষা উন্নয়নে ঋণ দান ও সহায়তার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।
৫. বিশ্বব্যাংকের সহযোগী উন্নয়ন সংস্থা আইডিএ শিক্ষা উন্নয়নে ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।
৬. সেভ দি চিলড্রেন শিক্ষা প্রোগ্রামে কার্যকর পদক্ষেপ সমূহ ব্যাখ্যা করুন।
৭. বাংলাদেশে শিক্ষা উন্নয়নে ব্র্যাকের গৃহীত শিক্ষা কর্মসূচীর প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।
৮. বিশ্বব্যাপী শিক্ষা উন্নয়নে ইউনিসেফ ও ইউনেস্কোর ভূমিকায় সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য তুলে ধরুন।
৯. ইউনিসেফ ও ইউনেস্কোর শিক্ষা কর্মসূচীর প্রভাবে শিক্ষা উন্নয়নে একটি প্রতিবেদন তৈরি করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

পাঠ- ৫.৫

১. অষ্টম জনবহুল দেশ কোনটি?
ক. তাঞ্জানিয়া
খ. বাংলাদেশ
গ. পাকিস্তান
ঘ. নাইজেরিয়া

২. মরিস ইয়েটস্ কোন দেশীয় নগর ভূগোলবিদ?
ক. মার্কিন
খ. জাপানি
গ. চৈনিক
ঘ. ইতালিয়

উত্তরমালাঃ ১. খ, ২. ক।

পাঠ- ৫.৬

১. শিক্ষকের পেশাগত শিক্ষার অভাব কোথায় দেখা যায়?
ক. নগরে
খ. গ্রামে
গ. স্কুলে
ঘ. কলেজে

উত্তরমালাঃ ১. খ

পাঠ- ৫.৭

১. চোখ উজ্জ্বল, কোন প্রদাহ রোগ নেই– কার প্রদত্ত সূচক?
ক. চক্ষু বিশেষজ্ঞ সংস্থা
খ. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
গ. ইউনিসেফ
ঘ. জাতিসংঘ

২. কোনটি এমডিজি এর অন্তর্ভুক্ত নয়?
ক. সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা
খ. মাতৃস্বাস্থ্য উন্নত করা
গ. শ্রমিকের সঠিক পারিশ্রমিক দেয়া
ঘ. লিঙ্গ সমতা

উত্তরমালাঃ ১. খ, ২. গ

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

পাঠ: ৫.৫

১. জনসংখ্যা বৃদ্ধি বলতে কী বোঝায়?

২. দেশান্তর কাকে বলে? উদাহরণ দিন।

পাঠ: ৫.৬

১. নগরের শিক্ষার্থীর চাহিদা কী?

পাঠ: ৫.৭

১. জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির উদ্দেশ্যসমূহ কী?

২. খাদ্যের প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।

৩. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উন্নয়নমূলক সামাজিক সূচকগুলো উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

পাঠ: ৫.৫

১. বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে সরকারি পদক্ষেপসমূহের বিবরণ দিন।

২. অভিপ্রয়াণের প্রভাবগুলোর ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ: ৫.৬

১. গ্রাম ও নগরের বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ: ৫.৭

১. ‘পরিবেশ ও শিক্ষা পরস্পর নির্ভরশীল’– বিশ্লেষণ করুন।

২. সুস্বাস্থ্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

৩. মানবজীবনে খাদ্যের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।